শুভ বৈশাখী পূর্ণিমায়

পূজ্য বনভান্তের বিশ্রামাগার দানোৎসর্গ উপলক্ষে স্মারক পুস্তিকা

স্মৃতির পাতায় বনভান্তে

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhante

স্মৃতির পাতায় বনভান্তে

সম্পাদনায় ঃ

সম্পাদনা পরিষদ

রাজবন বিহার, রাঙামাটি।

স্মৃতির পাতায় বনভান্তে

প্রকাশকাল ঃ

২৫৫১ বুদ্ধবর্ষের

১৯ মে ২০০৮ ইং

৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪ বাংলা

প্রকাশনায় ঃ

বনভন্তে প্রকাশনী

রাজবন বিহার, রাঙামাটি।

সম্পাদনায়

সম্পাদনা পরিষদ

রাজবন বিহার, রাঙামাটি।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ

শ্রীমৎ মহাপন্থক ভিক্ষু

শ্রীমৎ করুণাময় ভিক্ষু

সম্পাদকীয়

"বনভান্তে" (পরম পূজ্য শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির) এমন একটি নাম, যে নাম শুনে বৌদ্ধ অবৌদ্ধ সকলের তাঁকে এক পলক দেখার আগ্রহ জন্মে। যিনি এ অঞ্চলে মৌলিক বৌদ্ধধর্মের পথপ্রদর্শক।বর্তমানে তিনি কেবল বাংলাদেশে নয় গোটা বিশ্বে বৌদ্ধধর্মের এক অনন্য ধর্মগুরু হিসেবে পরিচিত। তিনি আমাদের গর্ব, গৌরব এবং অহংকার। আজ শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা। ত্রি-স্মৃতি (সিদ্ধার্থের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও মহাপরিনির্বাণ) বিজড়িত শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে সর্বজন পূজ্য বনভান্তের জন্য প্রায় কোটি টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত ভবনটি দানোৎসর্গ করা হচ্ছে। এ দানোৎসর্গ উপলক্ষে **"স্মৃতির পাতায় বনভান্তে"** নামে একটি বিশেষ প্রকাশনা আজ প্রকাশিত হল। পরম পূজ্য বনভান্তের আদর্শ অনুসরণ করে, অনুপ্রাণিত হয়ে শত শত (চাকমা, মারমা, বড়ুয়া, তঞ্চঙ্গ্যা) যুবক প্রব্রজ্জিত জীবন গ্রহণ করেছেন। যদিও বা পূজ্য বনভান্তের ভাষায় তিনি এখনো কাউকে বুঝাতে সক্ষম হননি, তবে সেই শত শত প্রব্রজিতের মধ্যে শ্রদ্ধেয় বনভান্তের প্রত্যাশিত আশানুরূপ উচ্চ শিক্ষিত (উচ্চতর ডিগ্রীধারী, ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়ার) প্রব্রজ্জিত হতে পারেনি; যারা পালি, ইংরেজী, বাংলা ও বিভিন্ন ভাষায় দক্ষ এবং তারা ত্রিপিটক গবেষণা করতঃ নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ করে আপামর দায়ক-দায়িকাদের মাঝে ত্রিপিটক শাস্ত্রকে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করবেন। আর দায়ক-দায়িকারা তাদের দেশনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রকৃত সদ্ধর্মকে শিক্ষা, অভ্যাস, আচরণ, প্রতিপালন ও পুণ্যকর্ম সম্পাদন করবেন। এতে সদ্ধর্ম আচরণ, চর্চা প্রতিপালনের মাধ্যমে এ অঞ্চলে সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি বয়ে নিয়ে আসবে।

এক সময় পূজ্য বনভান্তে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের দেখায়ে দিয়ে বলতেন এদের নাতি-পুতিদের সময়কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব। কারণ তারা (ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নাতি-পুতিরা) আমার কথা বিশ্বাস করবে। অর্থাৎ ধর্মাচরণ ও ধর্মচর্চা করে মার্গফল লাভ করতে সক্ষম হবে। উল্লেখ্য, ইদানিং পূজ্য বনভান্তের দেশনার সুর পাল্টে গেছে। বিভিন্ন দেশনায় তিনি বলেন যে- বুদ্ধ আশি বৎসর বয়সে পরিনির্বাণ লাভ করেছেন, তিনি ৮৯ বছরের বেশি হয়েছেন [illegible] । একথা বলার একমাত্র কারণ ভিক্ষুসঙ্ঘ এবং দায়ক-দায়িকারা কেউ নিজ নিজ কর্তব্যকর্ম প্রতিপালনে সচেষ্ট নয়। অর্থাৎ দায়ক-দায়িকাদের যেভাবে দান-শীল-ভাবনাময় পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা উচিত সেভাবে পুণ্যকর্মে নিয়োজিত নয়, আর ভিক্ষু-শ্রামণেরাও শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা অনুশীলনে আন্তরিক নয়। এক কথায় বলতে গেলে পূজ্য ভান্তের দেশনায় ভিক্ষুসঙ্ঘ এবং দায়ক-দায়িকাদের প্রকৃত সদ্ধর্ম চর্চা, আচরণ ও প্রতিপালন হচ্ছে না। তাই তাঁর দেশনার এ হতাশাগ্রস্ত সুর। এ হতাশাগ্রস্ত সুর পরিবর্তনের জন্য সর্বস্তরের দায়ক-দায়িকা ও ভিক্ষুসঙ্ঘের নিজ নিজ কর্তব্যকর্ম (দান-শীল-ভাবনা ও শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা) সম্পাদনে আন্তরিক হওয়া অত্যন্ত জরুরী।

এক সময় পূজ্য বনভান্তে এ রাজবন বিহারকে দ্বিতীয় লন্ডন শহরে পরিণত করার কথা বলতেন। তবে তিনি লোকোত্তর জ্ঞানের দিক দিয়ে নাকি বড় বড় ইমারত তৈরী করে লন্ডন শহরে পরিণত করবেন সেটা একমাত্র তিনিই জানেন। অবশ্য পূজ্য বনভান্তের দেশনায় দায়ক-দায়িকাদের দানের দিক দিয়ে কিছুটা হলেও উন্নতি হয়েছে বলা যায়। তার কারণ রাজবন বিহার তথা বিভিন্ন শাখা বন বিহার ও অন্যান্য বিহার সমূহে দায়ক-দায়িকাদের শ্রদ্ধাদানে বিভিন্ন ভবন নির্মিত হচ্ছে। আরো স্মর্তব্য যে, দায়ক-দায়িকাদের শ্রদ্ধাদানে **'নিভা'** নামের একটি রাশিয়ান জীপ গাড়ী (বিশেষ করে বনরূপা নিবাসী মনীষা বাপের অগ্রণী ভূমিকায়), একটি **'কার'** (ডাঃ প্রভাত চাকমা কর্তৃক প্রদত্ত), একটি **'মাইক্রো'** (সর্বস্তরের দায়ক-দায়িকাদের শ্রদ্ধাদানে), একটি ডাবল কেবিন **'পিক আপ'** (খাগড়াছড়ি নিবাসী বাবু কংহ্লাচাই চৌধুরী কর্তৃক প্রদত্ত) এবং একটি **'প্রাডো'** (ল্যান্ডক্রুজার) সর্বস্তরের দায়ক-দায়িকাদের শ্রদ্ধাদানে (যেটি) তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে ৮ জানুয়ারি ২০০৮ইং দান করা হয়।

যারা বিভিন্ন লেখা দিয়ে এ প্রকাশনাকে ঋদ্ধ ও পাঠোপোযোগী করেছেন তাদের জানায় আন্তরিক সাধুবাদ ও কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জ্ঞাপন করছি তাদের, এ প্রকাশনা প্রকাশের জন্য যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। উল্লেখ্য যে, ঢাকা নিবাসী দীপালি চাকমা (তোড়া মা) এ প্রকাশনায় কিছু শ্রদ্ধাদান দিয়ে পুণ্যের ভাগী হয়েছেন। তাদের বিভিন্ন সহযোগিতা না পেলে এ প্রকাশনাটি প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। পূজ্য বনভান্তের বিশ্রামাগারটি নির্মাণেও সর্বস্তরের দায়ক-দায়িকাদের কাছ থেকে বিভিন্ন (অনেকে ব্যক্তিগতভাবে লৌহ, সিমেন্ট, বালি, ইট ও বাঁশ দান দিয়েছেন) সহযোগিতা পেয়েছি। বিশেষ করে *Disha design Associates, Chittagong*-এর *Architect Ashis Chakma, B.Arch (Buet), Ingineer Md. Salim Raza, Ingineer in Civil, Ingineer Tiplu Sarkar, Ingineer. in Civil* ও রাঙামাটির *Architect Rita Chakma, Sub-Ingineer Doyal Chakma*-র অবদান অনস্বীকার্য। তাদের দিক নির্দেশনা না পেলে এ ধরনের বিশ্রামাগার নির্মাণ কল্পনাও করা যেত না। সকলকে রাজবন বিহারের ভিক্ষুসংঘের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা, সাধুবাদ এবং আশীর্বাদ জ্ঞাপন করছি।

সর্বশেষ আজ এ শুভ বৈশাখী পূর্ণিমায় সর্বস্তরের দায়ক-দায়িকাদের শ্রদ্ধাদানে প্রায় কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত লিফ্‌ট সংযুক্ত অত্যাধুনিক বিশ্রামাগারটি দান করা হচ্ছে। আপামর দায়ক-দায়িকা তথা ভিক্ষু-শ্রামণদের যেভাবে দানের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস উৎপন্ন হয়েছে সেভাবে শীল প্রতিপালন ও ভাবনা/সমাধিতে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস উৎপন্ন হয়ে সম্যক জ্ঞান উৎপন্ন হোক। আর সেই জ্ঞানে প্রত্যেকে কর্ত্তব্যকর্মে নিয়োজিত থেকে লোভ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয় করে নির্বাণ লাভের হেতু হোক।

সূচীপত্র

❑ **খুলে যাক্ স্মৃতির রুদ্ধদুয়ার**

ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু ০১

❑ **রাঙামাটির বৈচিত্র্য ও পুণ্যতীর্থ রাজবন বিহার**

শ্রীমৎ আদিকল্যাণ ভিক্ষু ২৩

❑ **পরম শ্রদ্ধেয় বনভান্তের স্বপ্ন**

শ্রীমৎ জ্ঞান জ্যোতি ভিক্ষু ২৬

❑ ***Significance Of The Buddha Purnima***

By- Saranankar Bhikkhu *28*

❑ **কথায় নয়, কাজে বিশ্বাসী হই**

শ্রীমৎ জ্ঞানদর্শী ভিক্ষু ৩৭

❑ **বনভন্তে, মম হৃদয়মন্দিরে তুমি চির অধিষ্ঠিত**

শ্রীমৎ শোভিত ভিক্ষু ৪২

❑ **বৌদ্ধধর্ম ও বর্তমান চিত্র**

শ্রীমৎ অভিজ্ঞানন্দ ভিক্ষু ৪৯

❑ **পূর্ণিমা**

আনন্দ জগৎ ভিক্ষু ৫১

খুলে যাক্ স্মৃতির রুদ্ধদুয়ার

ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি

পরম পূজ্য বনভন্তে রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করার এক যুগেরও পরে আমি ১৯৮৯ সালের মাঝামাঝিতে তাঁর পবিত্র সান্নিধ্যে প্রব্রজিত হই। সেই হতে পূজ্য ভন্তেকে কাছে থেকে দেখার, তাঁর লোকোত্তর জ্ঞানঋদ্ধ সংস্পর্শে ধন্য হবার মহা সুযোগ লাভ করি। এই প্রাপ্তিতে আজ আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান সত্ত্ব হিসাবে অনুভব করি। এ'কথা কলমের কালিতে বর্ণনা করতে পারব না। ১৯৮৯ সালের মাঝামাঝি হতে বর্তমানে ২০০৮ সালের প্রায় মাঝামাঝি, ১৮টি বছর কেটে গেল। তথাগত বুদ্ধের ভাষায়, পূজ্য বনভন্তের চীবরের কোণ ধরে। হিসাবের অংকে ১৮ বছর হলেও স্মৃতির আভায় যখন উজ্জ্বল হয়, অনুভবের ছোঁয়ায় ধরা দেয় তখন তো মনে হয় আটার বছর কই? এই– তো মাত্র সেদিনের কথা, সেদিনই প্রব্রজ্যা নিয়েছি আমি।

পূজ্য বনভন্তের জন্য নব নির্মিত **"আবাসিক ভবন"** দানোৎসর্গ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রকাশিতব্য স্মরণীকায় কিছু লেখতে গিয়ে আমি আমার লেখার বিষয়–বস্তু হিসাবে বেছে নিয়েছি আমার আটার বছরের দেখা পূজ্য বনভন্তের আবাসস্থল বা আবাসিক ভবনসমূহ। সঙ্গত কারণে আমাকে ফিরে যেতে হচ্ছে অতীতে। অতীতের কথায় ফিরে যাচ্ছি? প্রব্রজ্যা জীবনের উষালগ্নে। এখানে একটি কথা বলে রাখা উচিত বলে মনে করছি। স্মৃতির গতি বেশ জটিল; কোন বাঁধাধরা নিয়ম মেনে চলে না। কখনও উর্ধ্বমুখি, কখনও অধোগামী, কখনও সুস্পষ্ট হয়ে, কখনও বা মৃদু কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে হাজির হয় স্মৃতিপথে। তাই এখানে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা দুরুহ হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই। বরং প্রায়ই ধারাবাহিকতার বেড়া টপকে অন্যপথ ধরবে।

১৯৮৯ সাল, তখনকার রাজবন বিহার ছিল বেশ সাদামাথার। মূল বিহার বিল্ডিং ও পূজ্য বনভন্তের ভোজনালয় ছাড়া কোন পাকা ভবন ছিল না। বর্তমানের বহু অট্টালিকা সমৃদ্ধ রাজবন বিহার কম্পপ্লেক্স–এর সাথে তুলনা করার কোন জো ছিল না। আজকের বহুতল বিশিষ্ট ইটের জৌলুসের বদলে তখন সবুজ গাছগাছালি ও প্রকৃতির গা–ছোয়াঁছুঁয়ি পরিবেশে ঢাকা ছিল। পূজ্য বনভন্তে যদিও মাঝে মাঝে রাজবন বিহারকে লন্ডন শহরে পরিণত করার কথা শুনাতেন। কিন্তু সেটা তিনি বড়ো বড়ো ইমারত তৈরী করে নাকি লোকোত্তর জ্ঞানের (?) লন্ডন শহরে পরিণত করার কথা বলতেন তা' নিয়ে বেশ কৌতূহল ছিল অনেকের মনে। বর্তমানে যেই মাঠটিতে

মূল বিহার কম্পপ্লেক্স গড়ে উঠেছে, সেটি তখন এতো প্রশস্ত, পরিপাটি ছিল না। মাঠের পূর্ব ও উত্তরদিকটা ছিল খাড়া, ঝোপ–ঝাঁড়যুক্ত ঢালুভূমি। পশ্চিমদিকটাও একই রকম ছিল বলা চলে। দক্ষিণদিকটা ঝোপ–ঝাঁড়যুক্ত না থাকলেও বেশ খাড়া ছিল। সব মিলিয়ে বলা যায়, অরণ্যাচ্ছাদিত অনুচ্চ এক পাহাড়ী টিলার পিঠই ছিল মাঠটি। শুনাকথা, ইতিপূর্বে নাকি সেরকমও ছিল না মাঠটি। ১৯৮৬ সালে মাটি কেটে সেটুকু প্রশস্ত করা হয়েছিল। যাক্ সেসব আগের কথা, সে ব্যাপারে আমি তেমন কিছুই জানি না। পরবর্তীতে অট্টলিকা সমৃদ্ধ রাজবন বিহার কম্পপ্লেক্স গড়তে মাটি ভরাট করে পুরো মাঠের পুষ্টিসাধন করা হয়েছে। মাঠের দক্ষিণদিকে এখন যেখানে গেইট বিল্ডিং নামে একটি তিনতল বিশিষ্ট ভিক্ষু আবাস (ভবন) রয়েছে, সেখানে ছিল দশ/এগার ধাপযুক্ত একটি পাকা সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়ে মূল বিহার চত্ত্বরে প্রবেশ করতে হতো। সিঁড়ি অতিক্রম করে কয়েক পা এগুলেই টিনের ছাউনী বিহার কাম দেশনালয়ে পৌঁছা যেতো। যার অর্থ মাঠের দক্ষিণপার্শ্বের প্রায় শেষ বিন্দুতে ছিল (পুরানো) বিহার কাম দেশনালয়টি। বিহার ও দেশনালয়টি একত্রে হলেও বিহারটি ছিল পূর্বমুখী আর দেশনালয়টি ছিল দক্ষিণমুখী। তবে হ্যাঁ, ১৯৮৮ সালে নতুন দ্বিতল বিশিষ্ট মূল বিহার ভবন নির্মিত হবার পর সেটি মূলতঃ দেশনালয় হিসাবেই গণ্য করা হতো, ব্যবহৃত হতো। কিন্তু তারপরও (পূর্বে প্রতিষ্ঠিত) বুদ্ধমূর্তিসমূহ যথাস্থানে রক্ষিত ছিল। দায়ক–দায়িকারা সেখানেই বুদ্ধ বন্দনার কাজ সেরে নিতেন। আমরা অধিকাংশ শ্রামণেরাও তাই করতাম। সেসময় আমরা দৈনিক তিনবার বন্দনা করতাম। সেই তিনবারের মধ্যে ভোর ও দুপুরের বন্দনা দেশনালয়ে করতাম। সন্ধ্যার বন্দনা পর্বটি করতাম যার যার রুমে। মাঠের একেবারে উত্তরপার্শ্বে ছিল তলাপাকা, টিনের ছাউনীওয়ালা বাংলো টাইপের একটি গুদাম ঘর। আর সেটিই ছিল পূজ্য বনভন্তের আবাসিক কুঠি। রাঙ্গামাটির স্বনামধন্য ব্যক্তি (বর্তমানে প্রয়াত) অজিতকুমার দেওয়ান পূজ্য বনভন্তের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে তাঁর অবস্থানের জন্য নিজের শ্রদ্ধাদানে নির্মাণ করে দান দিয়েছিলেন সেই কুঠিটি। পূর্বমূখী কুঠি–এর তিনপার্শ্বেই বারান্দা ছিল। যতদূর মনে পড়ে, দক্ষিণপার্শ্বের বারান্দায় পূজ্য ভন্তের জন্য একটি আসন পাতা থাকতো সব সময়। তবে ভন্তে দেশনালয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট আসনে বসতেন বেশি। দায়ক–দায়িকা উপস্থিত থাকলেও তিনি দেশনালয়ে গিয়ে বসতেন, না থাকলেও বসে থাকতেন। কেবল মাঝে মাঝে বারান্দার সেই আসনে বসে দায়ক–দায়িকা, ভিক্ষুসঙ্ঘকে ধর্মদেশনা প্রদান করতেন। পশ্চিম পার্শ্বের বারান্দায় চীবর দিয়ে কামরা তৈরী করে নিয়ে তিন/চারজন শ্রামন অবস্থান করতেন। যাতে করে পূজ্য ভন্তে ডাকামাত্র ভন্তের সমীপে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয়। ভন্তের রুমের উত্তরদিকে আরো একটি ছোট্ট রুম ছিল কুঠিতে। সাধারণত যেই শ্রামণেরা

ভন্তেকে সেবা করতে অভ্যস্ত তাদের জন্য নির্ধারিত থাকতো রুমটি। বলা বাহুল্য, সেসময় ভন্তের জন্য নির্দিষ্ট কোন সেবক ছিলেন না। একেক সময় একেকজন শ্রামণ ভন্তের প্রধানসেবকের দায়িত্ব পালন করতো, আর অন্যরা তাকে সাহায্য করতেন। তবে তাদেরকে ভিক্ষুসঙ্ঘ কর্তৃক মনোনীত করা হতো না, তারা স্বীয় ইচ্ছায় সেটা করতেন। পূজ্য ভন্তের আবাসিক কুঠি–এর সামনে অর্থাৎ পূর্বদিকে ছিল তর্জা ছাউনীর একটি চংক্রমণশালা। যেখানে পূজ্য ভন্তে মাঝে মাঝে কিছু সময়ের জন্য একাই (লাঠি ধরে) চংক্রমণ করতেন। তবে সেসময় তিনি লাঠি ব্যবহার করতেন নামে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে লাঠিতে ভর দিয়ে চলতে হতো না তাঁকে। সেই চংক্রমণ করার অভ্যাসটি তিনি পরবর্তীতেও বেশ কয়েক বছর অব্যাহত রেখেছিলেন। এমনকি যখন ১৯৯৫ সালে বর্তমান চাকমা রাজমাতা আরতি রায় ও শ্রদ্ধাবান উপাসক বাবু ইন্দ্রনাথ চাকমার উদ্যোগে পুরানো চংক্রমণশালাটি ভেঙ্গে তৎস্থানে নতুন পাকা চংক্রমণশালা নির্মাণ করে দেন, তখনও তিনি সেখানে (পাকা চংক্রমণশালায়) বেশ কিছু সময় ধরে চংক্রমণ করেছিলেন। বর্তমানে যেখানে উপাসনা বিহার, বনভন্তের প্রতিমূর্তি বিহার ও ভিক্ষুদের ভোজনালয় নির্মিত হয়েছে, তখন সেসব স্থান ছিল গাছ–গাছালিতে পূর্ণ। মনে পড়ে, সেই স্থানটিতে বিহারের জাঁকজমকপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহও অনুষ্ঠিত হতো সেসময়। আগেই উল্লেখ করেছি, ১৯৮৮ সালে দ্বিতল বিশিষ্ট মূল বিহার বিল্ডিং নির্মিত হয়েছিল। সে বিল্ডিং–এর ছাদে ভন্তে অবস্থানের জন্য টাইলস, এসি লাগানো একটি রুম ছিল। কিন্তু কেন জানি ভন্তে সেখানে খুবই কম অবস্থান করতেন। বাংলো টাইপের গুদাম কুঠিতে অবস্থান করতেন বেশি। তবে সেটাকে অবস্থান করা না বলে বিশ্রাম করতেন বলাই যুক্তিসঙ্গত হবে। কারণ চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে প্রায় ষোল/সতের ঘন্টা কাটিয়ে দিতেন তিনি দেশনালয়ে। সকালে ভোজনালয়ে গিয়ে যৎসামান্য প্রাতঃরাশ গ্রহণ শেষে সোজা দেশনালয়ে চলে যেতেন। এভাবে শুরু হতো তাঁর দেশনালয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকার পর্ব। সাড়ে দশটায় (কুঠিতে) ফিরে এসে স্নান করতঃ ভোজনালয়ে গিয়ে আহার সেরে নিতেন। তারপর পুনরায় দেশনালয়ে গিয়ে বসতেন তাঁর নির্দিষ্ট আসনে। ভাবতে অবাক লাগে, কোন দিন ব্যতিক্রম হতো না সেই নিয়ম। কী ভীষণ ধৈর্য্যের সাথে তিনি অপরের কল্যাণার্থে নিজেকে সঁপে দিতেন। সদ্ধর্মহারা, জ্ঞানহারা নর–নারীর চিত্তে জ্ঞান ও সত্যের প্রবাহধারা বইয়ে দিতে অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেন সানন্দে। সেসময় দেশনালয়ে প্রতিদিন কি দায়ক–দায়িকার ভিড় থাকতো? না, তখন দায়ক–দায়িকাদের ভিড়ের দৃশ্য পরিলক্ষিত হবার ঘটনা ছিল বিরল। বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিনগুলোতে কেবল দেশনালয়ে দায়ক–দায়িকার ভিড় থাকতো। অন্যসময় দেখা যেতো কখনও জনা দশ/বিশেক দায়ক–দায়িকা, কখনও একটু

বেশি, কখনও তার চেয়ে কম; কখনও বা পুরো দেশনালয় ফাঁকা, ব্যজনী দানরত শ্রামণগণ ও পূজ্য বনভন্তে ছাড়া কেউই নেই। সেসব তোয়াক্কা না করে প্রতিদিন যথানিয়মে দেশনালয়ে গিয়ে নিজের আসনে আসীন হতেন তিনি। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত, মধ্যরাতে তিনি কুঠিতে ফিরতেন বিশ্রামের জন্য। আমার স্পষ্ট মনে আছে, সেসময় আমিও বহুবার গভীর রাত পর্যন্ত ভন্তেকে ব্যজনীদান করেছিলাম দেশনালয়ে। কোন কোন সময় এমন ঘটনাও ঘটেছিল। ভন্তে স্বীয় আসনে চোখ বুজে ধ্যানসুখে নিমগ্ন আর আমরা দাঁড়িয়ে ব্যজনী প্রদান করতে করতে রাত সাড়ে ১২টা/১টা বেজে যাচ্ছে; হঠাৎ ভন্তে চোখ মেলে আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন 'সাতটা/আটটা বেজেছে কি? আমরা উত্তর দিতাম– ভন্তে, রাত সাড়ে বারটা/১টা বেজেছে। অমনি ভন্তে বলতেন, আরো কিছুক্ষণ থাকি এখানে। এ' প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ না করে পারছি না। (আমার) শ্রামণ জীবনের প্রথমদিকে গভীর রাত পর্যন্ত ভন্তেকে ব্যজনী প্রদানের সময় মনে মনে ভাবতাম কখন ভন্তে কুঠিতে যাবেন। এতো রাত হয়ে গেল, তবু কেন ভন্তে চলো, কুঠিতে যাই' বলছেন না। আর যখন ভন্তে বলতেন– 'চলো, এখন কুঠিতে যাই'। তখন ছাড়া পাওয়া গেল বলে মনে মনে আনন্দিত হতাম। সে কথা মনে পড়লে আজও লজ্জিত বোধ করি। পরবর্তীতে অবশ্য তেমন হতো না। বরং চিন্তা করতাম, মহাপুরুষকে এভাবে সেবা করা ক'জনের ভাগ্যে জোটে! বলা যায়, নিতান্ত বিশ্রামের তাগিদে ভন্তে দেশনালয় হতে কুঠিতে আসতেন, খাটে শুয়ে পড়তেন। ভন্তের খাটটি পূর্ব–পশ্চিম করে পাতা থাকতো। অবশ্য কোন কোন সময় বিশেষ দরকার বশতঃ তাড়াতাড়ি দেশনালয় ছেড়ে কুঠিতে আসতেন তিনি। তবে বিশ্রামের রুমে না ঢুকে দক্ষিণপার্শ্বের বারান্দায় পেতে রাখা আসনে গিয়ে বসতেন। আর সেখানে মধ্যরাত অবধি ধ্যানসুখে নিমগ্ন থাকতেন। সেবক শ্রামণেরা ব্যজনী প্রদানে রত থাকতেন–যতক্ষণ না তিনি বিশ্রামের রুমে ঢুকতেন। শীতের রাতে কিন্তু গভীর রাত পর্যন্ত দেশনালয়ে অবস্থান করা হতে বিরত থাকতেন। দশটা/এগারটায় কুঠিতে চলে আসতেন।

খুব ভোর হতেই ভিক্ষু–শ্রামণেরা পূজ্য ভন্তের কুঠি–এর বারান্দায় জমায়েত হতেন। আর আগ্রহের চোখে তাকিয়ে থাকতেন ভন্তের রুমের দরজায়। কখন ভন্তে দরজা খুলে দিবেন। সব আগ্রহের অবসান ঘটিয়ে ভন্তে দরজা খুঁলে দিতেন, তখন ভিক্ষু–শ্রামণেরা রুমে ঢুকে ভন্তের চরণ স্পর্শ করে বন্দনা করতঃ সুবিধামত স্থানে বসে পড়তেন। অমনি ভন্তে শুরু করে দিতেন দুঃখমুক্তি নির্বাণ পথপ্রদর্শক অমৃতময় ধর্মদেশনা। তাঁর সুদীর্ঘ সাধনা জীবনের কথা উল্লেখ করে তিনি ভিক্ষু–শ্রামণেরদেরকে জ্ঞান ও সত্যাশ্রয়ী হয়ে নির্বাণ লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ

বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আজও যখন সেই দৃশ্য মনের আয়নায় ভেসে ওঠে, তখন এক ধরনের আনন্দ অনুভূতি স্পর্শ করে হৃদয় তন্ত্রীতে। হঠাৎ আবেগে আপ্লুত হতে চাই মন-প্রাণ। উপদেশ্চলে তিনি আমাদেরকে প্রশ্ন করতেন, আমরা উত্তর দিতাম। আবার আমরা কোন বিষয় জানার জন্য সবিনয়ে নানা প্রশ্ন রাখতাম, তিনি বুঝিয়ে দিতেন সেই বিষয়। সেই দিনগুলোর তরতাজা স্মৃতি আজও যেন কান পাতলে শুনতে পাই, চোখবুজে থাকলে স্মৃতির ক্যানভাসে ভেসে ওঠে পরিষ্কার, নির্ভুলভাবে। আজ লেখতে বসেও সেসব স্মৃতি চোখে ভেসে উঠছে বার বার। সেসব মধুর, সুদুর্লভ স্মৃতি মনের দরজায় ধাক্কা দিলে কেনই-বা আবেগ তাড়িত করবে না? বিশেষতঃ বর্তমানে যখন সেরূপ ঘটনা পুনরাবৃত্তির সুযোগ প্রায় বন্ধ রয়েছে। জীবনের অন্যতম সেই শ্রেষ্ঠ স্মৃতি কি আর ভুলা যায়? আজও ভুলিনি সেই দিনগুলোর কথা। জানি, ভুলতেও পারব না কোনদিন। স্মৃতির পাতায় বা হৃদয়ে অম্লান হয়ে রবে আজীবন। এমনকি পুর্নজন্ম হতে হলে, তখনও..।

সে সময় পূজ্য বনভন্তে ভিক্ষু-শ্রামণেরদেরকে অনুশাসন করতেন অত্যন্ত শক্ত হাতে। বিনয়ের প্রতি তাঁর অবস্থান ছিল একেবারে কঠোর। কোন প্রকার শিথিলতা প্রদর্শন বা ছাড় দিতেন না তিনি। আমার স্পষ্ট মনে আছে, একদিন পূজ্য ভন্তে তাঁর আবাসিক কুঠি-এর (দক্ষিণ পার্শ্বের) বারান্দার আসনে বসে আছেন। এমন সময় একজন ভিক্ষুর (ইচ্ছা করেই নাম উল্লেখ করলাম না) আপন বোন (যুবতী) মূল বিহার বিল্ডিং-এর নিচতলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের রুমে (যেখানে আপন ভাই ভিক্ষুটি অবস্থান করতো) ঢুকে পড়লো। ভন্তের দৃষ্টিতে ধরা পড়লো সে দৃশ্যটা। সঙ্গো সঙ্গো একজন শ্রামণ দিয়ে ডেকে পাঠালেন ভিক্ষুকে। ভিক্ষুর আর বুঝতে বাকী রইল না, কেন ভন্তে তাকে ডেকে পাঠালেন। সে সহসা ভন্তের কাছে এসে জানালেন, মেয়েটি তার গৃহী জীবনের আপন ছোট বোন। নিয়ম না জেনে ভাই ভেবে হঠাৎ রুমে ঢুকে পড়েছে। আর সেও ইচ্ছা করে রুমে ঢুকতে দেয়নি। বলা বাহুল্য, সেই ভিক্ষুটিকে পূজ্য বনভন্তে বেশ স্নেহের চোখে দেখতেন। কারণ তখন পর্যন্ত সেই ছিলেন ভন্তের শিষ্যগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত। তারপরও পূজ্য ভন্তে বলে উঠলেন- ভবিষ্যতে যাতে এরূপ না হয়। মনে রাখবে, মেয়ের সাথে কথা বলার জন্য আমি তোদেরকে এসব সুযোগ-সুবিধা করে দিই নি। তখন ভিক্ষুদের রুমে মহিলা প্রবেশের কোন অনুমতি ছিল না। একজন আদর্শ গুরু, সৎ উপদেষ্টা হিসাবে ভন্তের ভূমিকা অনন্যই (ছিল) বলতে হয়। শিষ্যদেরকে বিনয়ানুকুলে পরিচালিত করতে অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতেন তিনি। কোন ভিক্ষু (বিষেশতঃ দ্বিতল বিহার বিল্ডিং-এ অবস্থানরত ভিক্ষুগণ) কিভাবে আছেন, সেটা জানতে ভন্তে মাঝে মাঝে হুট করে গিয়ে রুমগুলো দেখে আসতেন। তখন নিয়ম ছিল, ভিক্ষুরা নিজেদের রুমের চাবি পেতেন মাত্র

এক কপি, বাকি দু'কপি চাবি থাকতো ভন্তের হাতে। কোন শ্রামণ বা ভিক্ষু যদি বিনয়, বিহারের নিয়ম শৃঙ্খলা লংঘন করতেন, সঙ্গো সঙ্গো তাকে ডেকে দন্ড প্রদান করতেন পূজ্য ভন্তে। বিহারের নিয়ম-শৃঙ্খলা এতো কঠোর ছিল যে, পূজ্য ভন্তের অনুমতি ছাড়া বিহার এলাকা হতে এক পাও বাইরে যাওয়া যেতো না। সে সময় ভিক্ষু-শ্রামণেরা বিনয় ও বিহারের নিয়ম মেনে চলার ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকতেন। এ'কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, পূজ্য ভন্তে শুরু থেকেই বিহারের যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডেও চোখ রাখতেন। তখনও সেটা অব্যাহত ছিল পুরোপুরি।

আগেই উল্লেখ করেছি, দ্বিতল বিহার বিল্ডিং-এর ছাদে ভন্তে অবস্থানের জন্য একটি রুম ছিল। তিনি সে রুমে বেশি সময় অবস্থান না করলেও মাঝে মাঝে অবস্থান করতেন। মাঝে মাঝে কখন? ভর দুপুরের খাঁ খাঁ রোদ্দুরের সময় যখন সারা শরীর ঘামে ভিজে একাকার হয়ে যেতো, তখন এ, সি'র শীতল হাওয়ায় শরীর ঠান্ডা করে নেওয়ার জন্য সেই রুমে ঢুকে কয়েক ঘন্টা অবস্থান করতেন। এখানে একটি কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। এ, সি রুমে ঢুকার সময় পূজ্য ভন্তে হাতের কাছে যেই শ্রামণ/শ্রামণদেরকে পেতেন তাকে নিয়ে যেতেন এ, সি'র শীতল হাওয়ার স্পর্শে। আবার, শীতকালে যখন শীতের প্রকোপ বেড়ে যেতো, তখনও ভন্তে মূল বিহার বিল্ডিং এর ছাদের রুমে গিয়ে অবস্থান করতেন, রাতের বিশ্রামের জন্য। সেসময় তিনি প্রতিদিনের ভোরের দেশনাটুকু সেই রুমে প্রদান করতেন। ভিক্ষু শ্রামণেরা নির্দিষ্ট সময়ের আগে ছাদে উঠার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন কখন ভন্তে রুমের দরজা, ছাদের দরজা খুলে দিবেন। ভন্তে নিজে হেঁটে এসে দরজা খুঁলে দিতেন। ও হ্যাঁ, সেই ছাদের রুমেও সব ভিক্ষু-শ্রামণের বসার জায়গা হতো না। অধিকাংশ ভিক্ষু-শ্রামণকে রুমের বাইরে, ছাদে বসে ধর্মশেনা শুনতে হতো। ভন্তের দেশনা সমাপ্ত হলে প্রাতঃরাশ গ্রহণের পর্ব শুরু হতো। একদিন প্রাতঃরাশ গ্রহণ শেষে একজন শ্রামণ (এই মুহূর্তে তার নাম মনে পড়ছে না।) প্রস্তাব দিলেন- "আচ্ছা, পূজ্য ভন্তে তো প্রাতঃরাশ গ্রহণ করে সকালবেলা এমনি এমনি দেশনালয়ে বসে থাকেন। আমরা শ্রামণেরা মিলে তাঁকে পাল্‌কিতে করে বিহার এলাকায় ঘুরালে ভালো হয়, নয় কি? আমাদেরও পুণ্য হবে।" তার সেই বুদ্ধিদীপ্ত ও পুণ্যময় প্রস্তাব সবার মনোপুত হওয়ায় সাধুবাদের সাথে গৃহীত হলো। সঙ্গো সঙ্গো ভন্তের সমীপে গিয়ে প্রার্থনা সহকারে নিবেদন করলাম সেটা। ভন্তেও অনুমোদন করলেন প্রার্থনাটি। সেই দিন থেকেই সকালের প্রাতঃরাশ শেষে আমরা শ্রামণেরা মিলে ভন্তেকে পাল্‌কিতে করে বিহার এলাকা ঘুরায়ে নিয়ে আসতাম। যা বহুদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। মনে পড়ে, পরবর্তীতে কয়েকজন ভিক্ষুও আমাদের সঙ্গো সেকাজে অংশ গ্রহণ করতেন সআগ্রহে।

১৯৮৯ সালের প্রবারণা পূর্ণিমা অনুষ্ঠানে ছয় লক্ষ টাকা দিয়ে পূজ্য ভন্তেকে নিভা নামের একটি রাশিয়ার তৈরী জীপ গাড়ী দান করা হয়। উল্লেখ্য যে, পূজ্য বনভন্তের জন্য ক্রয় করা হচ্ছে জেনে নাকি আমদানীকারকও ভন্তের প্রতি শ্রদ্ধা নিদর্শনস্বরূপ তার লভ্যাংশ নেননি। সে গাড়ীটির নম্বর **"রাংগামাটি–৭"**। ইংরেজীতে যেটি সৌভাগ্যের প্রতীক হিসাবে বলা হয়, লাকী সেভেন।

সেই হতে ভন্তেকে পাল্‌কিতে করে বিহার এলাকা ঘুরানো বন্ধ হয়ে যায়। তবে তাঁর পাল্‌কির ব্যবহার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি তখনও। যে জায়গাগুলোতে গাড়ী চলাচলের সুবিধা নেই, তেমন জায়গার ফাং–এ পাল্‌কিতে করে নিয়ে যাওয়া হতো ভন্তেকে। গাড়ী দান করার সঙ্গে সঙ্গে বিহারের রাস্তাগুলো বুলডোজারের মাধ্যমে প্রশস্ত করে কাটা হয়। পায়ে হেঁটে চলার রাস্তাগুলো বানিয়ে ফেলা হয় গাড়ী চলাচলের উপযোগী মহাসড়কে। আর মূল রাঙ্গামাটি শহরের সাথে সরাসরি সড়ক যোগাযোগের জন্য বিহারের উত্তর–পশ্চিম পার্শ্বে নতুন কাটা রাস্তাটি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের (নিজস্ব) সড়কের (রাঙামাটি সরকারী কলেজেরে পাশ দিয়ে) সংযোগ স্থাপন করা হয় (তবে বর্তমানে কে কে রায় সড়ক দিয়েও শহরের মূল রাস্তার সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে)। ফলে মূল রাঙ্গামাটি শহর তথা দেশের বিভিন্ন স্থান সরাসরি গাড়ী যোগে রাজবন বিহারের ভিটায় আসার সুযোগ রচিত হয়। যেটি পূর্বে সম্ভব হতো না।

১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলে বইয়ে যাওয়া প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে রাজবন বিহারেও অনেক ক্ষয়–ক্ষতি হয়। বিহার কাম দেশনালয়ের উপর আঘাত নেমে আসে বেশি, বাতাসের ফুৎকারে উড়ে যায় চূড়াটি। তছনছ হয় ছাউনীর টিন ও বেড়াগুলো। পূজ্য ভন্তের কুঠি–এর বারান্দার বেড়াগুলো খুলে যায় দমকা বাতাসে। তবে ছাউনীতে কোন ক্ষতি হয়নি। সেই ঝড়ো হাওয়ায় বড়ো একটি গাছ উপড়ে পড়ে বনভন্তে কুঠি–এর পূর্বপার্শ্বের চংক্রমণশালার উত্তরদিকটা দুমরে মুচড়ে যায়। আর ছোট, বড় গাছ ভেঙ্গে পড়ে বৈদ্যুতিক লাইনসমূহও ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বিহারের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ভিক্ষু আবাসগুলো প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয় কমবেশি। পরবর্তীতে ক্ষতিগ্রস্ত সেসব (বিহার ও ঘর–বাড়ি) মেরামত করা হলেও বিহার কাম দেশনালয়টি পুরানো চেহারা হারিয়ে ফেলে কেবল দেশনালয়ে পরিণত হয়। বিহার অংশটির বেড়াগুলো অর্ধেক (তিন ফুট বরাবর) করে কেটে ফেলা হয়। বুদ্ধমূর্তিগুলো অন্যত্র (বার্মার স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত সার্বজনীন উপাসনা বিহারে) সরিয়ে নেয়া হয়। আর তখন থেকেই পূজ্য বনভন্তে সেখানে (আগের বিহার অংশে) বসা শুরু করেন। যা কিনা বর্তমান দেশনালয়টি ভেঙ্গে ফেলা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। একই বছর মূল বিহারের দক্ষিণপার্শ্বের জায়গাটি কেটে

বিরাট মাঠ করা হয়। বর্তমানে যেখানে বিহারের সার্বজনীন অনুষ্ঠানসমূহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেটা ছিল একটা ঢালু পাহাড়। সেখানে ছিল হরেক রকমের গাছ গাছালি, প্রকৃতির অন্তরঙ্গতায় ভরপুর। গাছ গাছালির ফাঁকে ফাঁকে ছিল শনের ছাউনী ছোট দু'টো ভিক্ষু ভোজনশালা, তারই সামান্য নিচে একটি গুদামঘর; যেখানে খাদ্য জাতীয় দানীয় সামগ্রী জমা রাখা হতো। গুদাম ঘরের দক্ষিণপার্শ্বে একটু নিচে ছিল উনুনশালা। সেই টিলার দক্ষিণপার্শ্বে ছিল আরো একটি অনুচ্চ টিলা। বলা বাহল্য এ'দুটি টিলাকে আলাদা করে চেনার জন্যে বুঝি মাঝমাঝি ছিল একটি কিজিং। তবে বর্তমানে মাটি ভরাট করে কিজিংটি চেনাই যায় না। সেই অনুচ্চ ঢালু টিলাটি কেটে এখন তাবতিংশ ভবন, অতিথিশালা গড়ে উঠেছে। তাবতিংশ ভবনের স্থানটি ছিল অনুচ্চ টিলার পিট। অনুষ্ঠানের পর দায়ক-দায়িকারা সেসব ছায়া সুশীতল ঢালু ভূমিতে বিশ্রাম করতো, পরবর্তী অনুষ্ঠানের সময় পর্যন্ত। বলা বাহুল্য, সেসময় বিহারের সার্বজনীন অনুষ্ঠানগুলো সকাল-বিকাল দু'বেলারই হতো।

সময় বয়ে যায় আপন গতিতে। স্রোতস্বিনী নদীর মতন। এবার ১৯৯৩ সালের কথা বলছি আমি। এবছর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় পূজ্য বনভন্তের আবাসিক কুঠি বাংলো টাইপের গুদামটি ভেঙ্গে ফেলে তৎস্থানে দ্বিতল বিশিষ্ট পাকা ভবন নির্মাণ করা হবে। কারণ ইতোমধ্যে বিহারে বেশ কিছু পাকা ভবন গড়ে উঠলেও ভন্তে অবস্থানের জন্য আলাদা কোন পাকা ভবন নির্মিত হয়নি। ভন্তে সেই ১৯৮৩ সালে তাঁর জন্য নির্মিত গুদাম কুঠিতে অবস্থান করে আসছেন। যুগের চাহিদা অনুসারে যা দেখতে মোটেই শোভনীয় ছিল না। সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রেখে ভন্তের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ স্বরূপ শ্রদ্ধাশীলা উপাসিকা মিস্ লাকী চাকমা সে ব্যাপারে ভন্তের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তা' অনুমোদন করেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় নির্মাণকাজ। নির্মাণকাজ সুন্দর, নিখুঁত সুনিশ্চিত করতে চট্টগ্রাম থেকে নিয়ে আসা হয় রাজমিস্ত্রি আজাদসহ পুরো টিম। শ্রদ্ধাশীলা উপাসিকা মিস্ লাকী চাকমার অগ্রণী ভূকিমায় ও পুণ্যকামী দাতাদের শ্রদ্ধাদানে ১৭,৫০,০০০ টাকা ব্যয়ে ভন্তের সর্বঋতুতে বাসোপযোগী আধুনিক স্থাপত্য মডেলে এক মনোরম ভবন নির্মাণ করে দেওয়া হয় সহসা। নব নির্মিত শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সেই আবাসিক ভবন মহা সমারোহে দানোৎসর্গ কল্পে ১৪ ও ১৫ মার্চ '৯৪ইং দু'দিন ব্যাপি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথমদিকে মহান আর্যপুরুষ বনভন্তে মহোদয়ের সুকঠিন সাধনা, তাঁর ত্যাগময় জীবন ও কর্মে এতদঞ্চলে বৌদ্ধদের ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নয়ন এবং পুণ্যতীর্থ রাজবন বিহারের ক্রম পর্যায়িক সমৃদ্ধির আলোচনা সভা, দ্বিতীয় দিনে বনভন্তের আবাসিক ভবন দানোৎসর্গ, শুভ উদ্বোধন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয় দেশের স্বনামধন্য ভিক্ষুসঙ্ঘকে। হাজার হাজার দায়ক-দায়িকা সে'দানানুষ্ঠানে

স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে পুণ্যাংশ লাভে ধন্য হন। দানোৎসর্গের আনুষ্ঠনিকতা শেষে দ্বারোদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে পূজ্য বনভন্তে নব নির্মিত ভবনে পদার্পণ করেন সমবেত দায়ক-দায়িকাগণের গগণ প্রকম্পিত 'সাধু সাধু' ধ্বনির মধ্য দিয়ে। সেসময় মিস্ লাকী চাকমার অন্তর ভক্তিতে কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। অনুভূত হতে থাকে অবর্ণনীয় প্রীতি সুখ। দেহ ও মন তরঙ্গায়িত হয় পরম আনন্দে। পুণ্যকামী দাতাদের মনেও এক অনাবিল সুখানুভূতিতে উচ্ছ্বসিত হতে থাকে **"সার্থক হয়েছে, ধন্য হয়েছে আমাদের এ'দান"** বলে।

আগেই আমি উল্লেখ করেছি, স্মৃতির গতি বেশ জটিল, কখনও উর্ধ্বমুখি, কখনো অধোগামী হয়ে হাজির হয় স্মৃতিপটে। স্মৃতি মাঝে মাঝে এভাবে লুকোচুরি খেলা খেলতে ভালোবাসে যেন। একটি ঘটনা যা আগে, বেশ আগে ঘটেছে, কিন্তু মনে পরে, বেশ পরে। ঠিক তেমনি পূজ্য ভন্তের সেবকের প্রসঙ্গটিও আমার এক্ষুণি মনে পড়ল আবার। যা এতোক্ষণ স্মৃতি-প্রবাহে ভেসে ওঠেনি, অথচ ভেসে ওঠা উচিত ছিল। **'সুদূর'** শ্রামণ চীবর ত্যাগ করার পর সিনিয়র কয়েকজন শ্রামণ ক্রমান্বয়ে পূজ্য ভন্তের প্রধান সেবকের দায়িত্ব পালন করেন। তবে তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব পালনের আয়ুষ্কাল কখনো সুদীর্ঘ হয়নি। স্বল্প সময়ের মধ্যে তারা প্রধানসেবকের দায়িত্ব ছেড়ে দেন স্ব-ইচ্ছায়। এক সময় (এই মুহূর্তে আমার সঠিক সালটি মনে পড়ছে না) পূজ্য ভন্তের প্রধানসেবকের দায়িত্ব পালনে নিজকে মানিয়ে নেয় জ্যোতিসার শ্রামণ (বর্তমানে জ্যোতিসার স্থবির)। বলা বাহুল্য সেবক হিসাবে জ্যোতিসার পূজ্য ভন্তের কাছে হতে বেশ স্নেহ ও প্রীতিধন্য হয়েছিলেন। ভন্তের সাথে অন্তরঙ্গতা লাভেও সমর্থ হয়েছিলেন যথেষ্ট পরিমাণে। সে সময়ও পূজ্য ভন্তেকে সেবকের হাতে ভর দিয়ে চলতে হতো না এবং বর্তমানের মতন সেবককেও সর্বদা ভন্তের পাশ ঘেঁষে বসে (বা দাঁড়িয়ে) থাকতে হতো না। আমার স্পষ্ট মনে আছে, কোন কোন সময় এমনও হতো, হঠাৎ ভন্তের প্রধানসেবককে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, অথচ সে যথাস্থানে নেই। বেশ খোঁজাখুঁজির পর তাকে (প্রধান সেবককে) ডেকে নিয়ে আনতে হতো। অনেক সময় ভন্তে নিজেই সেই প্রয়োজনীয় কাজটুকু করে ফেলতেন, অথবা হাতের কাছে যেই শ্রামণকে পেতেন, তাকে দিয়ে করিয়ে নিতেন।

সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে পূজ্য বনভন্তের সম্যক জ্ঞানের খ্যাতি ও ত্যাগের মহিমার কথা ছড়িয়ে পড়ে বৃহত্তর পার্বত্যাঞ্চল তথা দেশের সর্বত্র, এমন কি বিদেশেও। তিনি সুদীর্ঘ সাধনালব্ধ অভিজ্ঞা দ্বারা বৌদ্ধধর্মের অমিয় বাণী প্রচার করে বৌদ্ধ সমাজে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেন। বৌদ্ধ সমাজের কাছে তিনি একজন লোকোত্তর মহামানব ও অতি শ্রদ্ধেয় বরণীয় ধর্মগুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হন। প্রতিদিন দেশের নানা প্রান্ত থেকে পুণ্যকামী নর-নারী ভন্তের ধর্মদেশনা শ্রবণ ও তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতে রাজবন বিহারে ছুটে আসতে শুরু

করেন। তাঁর অমৃতোপম নৈর্বাণিক ধর্মদেশনা শুনে সর্বস্তরের বৌদ্ধ নর–নারীগণ ধর্মীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হন দারুণভাবে। বলতে দ্বিধা নেই, তখন থেকে রাজবন বিহারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডেও গতি পায়। বিহারের উন্নয়নমূলক কাজ প্রসঙ্গে সেসময় পূজ্য ভন্তে বলতেন– **"ধর্মীয় উন্নতি বিধানকল্পে দক্ষ ভিক্ষুসঙ্ঘসহ সুখ–সুবিধা সম্বলিত বিহার থাকা প্রয়োজন। তজ্জন্য আমি রাজবন বিহারকে একটি উপযুক্ত, আদর্শ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় পাকা ভবন নির্মাণ ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যাদি করার উপর জোর দিচ্ছি। ভিক্ষুসঙ্ঘের সুবিধার জন্য রাজবন বিহার এলাকায় আরো বহুবিধ উন্নয়নমূলক কাজ করতে হবে। ধ্যান সাধনার উপযোগী সুব্যবস্থাদি করারও প্রয়োজন রয়েছে। আমি যদি এসব করতে না বলি ভবিষ্যতে অন্য ভিক্ষুদের পক্ষে এসব করা কঠিন হবে। তখন লোকের মনে প্রশ্ন জাগবে, বনভন্তে তো এসব করতে বলেননি, এই ভিক্ষু কেন করতে বলছে। সদ্ধর্মের গৌরব রক্ষা এবং ভবিষ্যতের উদাহরণ সৃষ্টির জন্য আমি বিহারের উন্নয়নমূলক কাজ করতে উপদেশ দিচ্ছি।"** রাজবন বিহারের ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড শুরু হয় সেভাবে। প্রথমদিকে পূজ্য ভন্তে সেই উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে চোখ রাখলেও পরবর্তীতে আর সেটা করতেন না। ভন্তের প্রধানসেবক (জ্যোতিসার ভিক্ষু) সে সবে চোখ রাখতেন সাগ্রহে। ফলে প্রধানসেবকের দায়িত্ব বেশ বেড়ে যায়, আগের তুলনায়। সবকিছু মিলে সে রাজবন বিহারে একজন গুরুত্বপূর্ণ ভিক্ষু হিসাবে পরিচিত লাভ করে। অস্বীকার করার জো নেই পূজ্য বনভন্তের কাছ থেকে অকৃপণ স্নেহধন্য ও বহু ঋদ্ধ অভিজ্ঞতার ছোঁয়া লাভেরও সুযোগ ঘটে তার। তবে তার এক ধরনের গো–ধরা স্বভাবের জন্য পরবর্তীতে সেই সৌভাগ্য ধরে রাখতে অসমর্থ হয় সে।

১৯৯১ সালের পর হতে পূজ্য ভন্তে দুঃখগ্রস্ত নর–নারীর কাতর প্রার্থনায় প্রায় এক দশকের পর পুনরায় পার্বত্যাঞ্চলের নানা স্থানে সদ্ধর্ম প্রচারে বেরিয়ে পড়েন। বিশেষত রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাদ্বয়ের আনাচে–কানাচে গমন করেন এলাকাবাসীদের বিনীত আমন্ত্রণে। সেসময় প্রধানসেবক পূজ্য ভন্তের সফর সঙ্গী হতো না, বিহারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড দেখাশুনা করতো সে। সফরসঙ্গী ভিক্ষুদের মধ্যে একেকজন ভিক্ষু একেক সময় সেবকের দায়িত্ব পালন করতেন নিজ আগ্রহে। আবার, অনেক সময় দুই/তিনজন ভিক্ষুকে যৌথভাবে সেবকের দায়িত্ব পালন করতেও দেখা যেতো। এখানে সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই, আমিও সেসময় অনেক ফাং–এ পূজ্য ভন্তের সেবকের দায়িত্ব পালন করার সুযোগ লাভ করি। পূজ্য ভন্তের একান্ত কাছে থেকে দিনরাত ছব্বিশ ঘন্টা তাঁর জ্ঞান সাহচর্য পাই অকপটে স্বীকার করছি। বহু শিক্ষণীয় বিষয়েও মধুর স্মৃতিতে ভরপুর ছিল

সেই দায়িত্ব পালনের দিনগুলো। সেদিনের সেই মধুর স্মৃতির কথা মনে বেশ রয়ে গেছে আজ অবধি। ভুলতেও পারব না কোন দিন। সেরূপ কিছু স্মৃতির কথা উল্লেখ না করে পারছি না। যেমন, এক সময় (সালটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না) পূজ্য বনভন্তে স্বশিষ্যে জুরাছড়িতে (পূর্বে শ্রদ্ধেয় ভন্তে **"শলক"** বলতেন) ফাং-এ যান। আর ভন্তের সেবকের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকি আমি। বেশ কিছুদিন জুরাছড়িতে অবস্থানের ফাঁকে একদিন শিলছড়ি গ্রামের নর-নারীগণ তাদের গ্রামে ভন্তেকে নিয়ে যেতে ফাং করেন। ভন্তেও তাদের প্রতি অনুকম্পা করতঃ সে ফাং গ্রহণ করেন। আর শিলছড়ি গ্রামে অবস্থান করার ফাঁকে বারাবান্যা গ্রামবাসীরাও তাদের গ্রামে ভন্তেকে নিয়ে যেতে ফাং করেন। পূজ্য ভন্তেও তাদের সে ফাং গ্রহণ করেন। নির্ধারিত দিনে শিলছড়ি গ্রাম থেকে রওনা হতে হলো বারাবান্যা গ্রামের উদ্দেশ্যে। অন্যান্য ভিক্ষুরা পাহাড়ী রাস্তা ধরে পায়ে হেঁটে গেলেও পূজ্য ভন্তেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হয় বাঁশের ভেলা। অর্থাৎ ভন্তে বসে থাকবেন ভেলায়, আর নর-নারীরা ভেলাতে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাবে স্রোতস্বিনী পাহাড়ী ছড়ার হাঁটু পরিমাণ জলপথ ধরে। সেবক হিসেবে আমিও ভেলাতে করে যাওয়ার সুযোগ পেলাম। ভন্তে ভেলায় চড়ে বসলে আমিও তাঁর পাশে বসি। এবার নর-নারীরা এঁকে বেঁকে যাওয়া সেই পাহাড়ী ছড়ার ছলছল স্রোতের বিপরীতে আমাদেরকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো সআগ্রহে। বলা বাহুল্য পাহাড়ী ছড়ার গভীরতা সবখানে সমান হয় না, মাঝে মাঝে গভীর জলকুন্ড থাকে। ভেলা দ্রুত টানতে গিয়ে নর-নারীরা হঠাৎ সেই জলকুন্ডে পড়ে, ভিজে জবজবে হয়ে যেতো। অমনি পূজ্য বনভন্তে আমাকে বলতেন- 'ইন্দ্রদত্ত, নারীদের দিকে লোভ চিত্তে তাকাস না? (এখানে বলে রাখা দরকার, সেসময় পূজ্য ভন্তে আমাকে ইন্দ্রদত্ত বলে ডাকতেন) আমি সংকোচবশে কখনো বলিনি যে আমার নাম ইন্দ্রদত্ত নয়, ইন্দ্রগুপ্ত। ২০০০ সালে আমার সংকলিত "আর্যশ্রাবক বনভন্তের ধর্মদেশনা, সিরিজ-১" বইটি পূজ্য ভন্তেকে সমর্পন করলে, তবেই আর ভন্তে জানতে পারেন আমার নাম ইন্দ্রদত্ত নয়, ইন্দ্রগুপ্ত। সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে প্রশ্ন করেন- তোমার নাম ইন্দ্রদত্ত নহে কি? আমি সবিনয়ে বলে উঠি- না ভন্তে, আমার নাম ইন্দ্রগুপ্ত। আমি মাথা নেড়ে বলতাম- হ্যাঁ, ভন্তে। সত্যিকথা বলতে কি, ভন্তের সেকথায় প্রথমদিকে আমার মনে এরূপ চিন্তা উদয় হয়েছিল- কেন ভন্তে এমন বলছেন? আমার তো সেরূপ চিত্ত উৎপন্ন হচ্ছে না। কিন্তু পরমুহূর্তে ভাবি, ভন্তে আমার প্রতি অত্যন্ত দয়া পরবশে একথা বলছেন। আমাকে আগাম সতর্ক করে দিচ্ছেন।

অন্য একসময় পূজ্য ভন্তে বিলাইছড়িতে ফাং-এ গেলে আমি, ধম্মবোধি ভিক্ষু, তেজপ্রিয় ভিক্ষু (বর্তমানে গৃহী) তিনজন ভিক্ষু মিলে সেবকের দায়িত্ব পালন করি। সে সময়টা ছিল ঘোর

শীতকাল। আর সেখানে শীতের প্রকোপটাও বেশি ছিল। ফলে আমাদেরকে তাড়াতাড়ি বিছানার আশ্রয় খুঁজতে হতো। এক রাতে ঘুমের ঘোরে আমাদের মধ্যে দু'জন নাক ডেকে ডেকে ঘুমায়। আর যাই কই! ভোরে ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই ভন্তে গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন– নাক ডেকে ডেকে ঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকাটা অজ্ঞানীর কাজ। প্রব্রজিতদেরকে ঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকা শোভা পায় না। তোমরা পাতলা পাতলা করে ঘুম যাবে। কিছুক্ষণ পর দায়ক–দায়িকারা আসলে পূজ্য ভন্তে আমাদের নাক ডেকে ঘুমার বোমাটা ফেটে দেন, তাদের সামনে। আমাদেরকে দেখায়ে দিয়ে বলতে শুরু করেন– এরা অজ্ঞান। গত রাতে নাক ডেকে ডেকেই ঘুমিয়েছিল। অমনি আমাদের চোখ–মুখ লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে; শীতের সকালেও দেহ গরম হয়ে যাবার অনুভব করি।

আরো একদিনের (ফাং–এর) কথা মনে পড়ছে। তবে সেসময় সেবকের দায়িত্বে ছিলাম না। দিনটি ছিল রাঙ্গামাটির তবলছড়িস্থ ট্রাইবেল অফির্সাস কলোনী দায়ক–দায়িকাদের আয়োজিত সার্বজনীন দানানুষ্ঠান। সকাল–বিকাল দু'বেলার অনুষ্ঠান। তখন তো সার্বজনীন অনুষ্টানসমূহ দু'বেলারই হতো। সকাল বেলার অনুষ্ঠান শেষে কয়েকজন দায়ক–দায়িকার একান্ত প্রার্থনায় পূজ্য ভন্তে তাদের বাড়ীতে পদধূলি দেয়ার ফাং গ্রহণ করেন। শুরু হয় বাড়ীতে বাড়ীতে পদধূলি দেওয়ার পালা। যদ্দূর মনে পড়ে, পূজ্য ভন্তের সঙ্গো আমরা চারজন ভিক্ষু যোগ দিই । এক এক বাড়ীতে পদধূলি দিতে দিতে এক পর্যায়ে সতীশ কানুনগোর বাড়ীতে উঠতে হলো। বলা বাহুল্য, সতীশ কানুনগো বনভন্তের পূর্ব পরিচিত; গৃহীকালিন চাচা সম্পর্কীয় আত্মীয়ও। বাড়ীতে ঢুকে নির্ধারিত আসন গ্রহণ করেই ভন্তে প্রসন্নচিত্তে সতীশ কানুনগোর উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা প্রদান শুরু করেন। দেশনা শেষ হলে পঞ্চশীল প্রার্থনা করা হল। বলা বাহূল্য, বহূ আগে থেকেই ভন্তে দায়ক–দায়িকাদেরকে পঞ্চশীল প্রদান করতেন না। তাঁর সঙ্গো থাকা ভিক্ষুদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ সাধারণত তিনিই পঞ্চশীল প্রদান করতেন। সেই নিয়ম অনুসারে আমি "যমহং বদামি..." বলে উঠি। অন্যদিকে পূজ্য বনভন্তেও "যমহং বদামি..." বলে ওঠেন। সঙ্গো সঙ্গো আমি চুপ হয়ে যাই, লজ্জায় আমার চোখ–মুখ লাল হয়ে ওঠে। অমনি পূজ্য ভন্তে আমার উদ্দেশ্যে বলে ওঠেন– **'অইয়ে তুই দে'**। অর্থাৎ ঠিক আছে, তুমিই দাও। আমি অনুতপ্ত ও সলজ্জা ভঙ্গিমায় বিনীতস্বরে বলে উঠি– "ভন্তে, আমাকে ক্ষমা করে দেন, আপনিই প্রদান করুন"। তখন লজ্জায় আমার মাথা ঘুরে পড়ে যাবার উপক্রম। খুব খারাপ ও অস্বস্তি লাগছিল এই ভেবে যে, কেন ভন্তের দিকে না তাকিয়ে আমি বোকার মতো 'যমহং বদামি..' বলতে গেলাম। এখন পূজ্য ভন্তে বা দায়ক–দায়িকারা কী ভাববেন আমাকে।

পূজ্য বনভন্তে ১৯৭৭ সাল থেকে স্থায়ীভাবে রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারে অবস্থান করার পর হতে কখনও অন্য বিহারে বর্ষাবাস যাপন করেননি। একটানা বাইশ বছর পর্যন্ত রাজবন বিহারে বর্ষাবাস যাপন করেন। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটে ১৯৯৯ সালে। খাগড়াছড়ি শহর হতে তিন কিলোমিটার উত্তরে ধর্মপুরে (বনভন্তের দেওয়া নাম এটি, পূর্বের নাম পেরাছড়া) **"আর্যবন বিহার"** প্রতিষ্ঠা হবার পর হতে খাগড়াছড়ি এলাকাবাসীরা বনভন্তের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েন। এসময় তারা চিন্তা করেন, আমরা খাগড়াছড়িবাসীরা তো পূজ্য ভন্তেকে একটানা দীর্ঘদিন ধরে সেবা-পূজা করার ও তাঁর দেশনা শ্রবণ করার সুযোগ পায়নি। যা এতদঞ্চলে সদ্ধর্মের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজন। অথচ মহাপুরুষগণ সমস্ত লোকের হিতের জন্য অনুকম্পা প্রদর্শন করে থাকেন। কাজেই আমরা যদি মনে-প্রাণে প্রার্থনা করি, তাহলে ভন্তেকে অবশ্যই দীর্ঘদিন ধরে সেবা-পূজা করার ও তাঁর ধর্মদেশনা শ্রবণ করে ধন্য হবার সুযোগ পাবোই। অতঃপর তারা পরামর্শ মাফিক প্রাক্তন সাংসদ বাবু উপেন্দ্রলাল চাকমা, মং সার্কেলের চীফ পাইহ্লাপ্রু চৌধুরী, প্রাক্তন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বাবু সমীরণ দেওয়ান, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বাবু যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরা, বাবু খুলারাম চাকমা, বাবু বিনোদ বিহারী চাকমা, বাবু প্রিয়কুমার চাকমা, বাবু বীরেন্দ্র বিজয় চাকমাসহ খাগড়াছড়ির আপামর জনসাধারণ মিলে পূজ্য বনভন্তেকে ১৯৯৯ সালের বর্ষাবাসটি খাগড়াছড়িস্থ আর্যবন বিহারে অবস্থান করার জন্য ফাং করেন। খাগড়াছড়িবাসীদের আকুল প্রার্থনায় ভন্তেও রাজবন বিহারের প্রধান শাখা **"আর্যবন বিহার"** খাগড়াছড়িতে বর্ষাবাস যাপনের ফাং গ্রহণ করেন। ভন্তে ফাং গ্রহণ করলে তারা অতিশয় খুশি, সন্তোষ ও আনন্দের বার্তা নিয়ে খাগড়াছড়িতে ফিরে যায়। আর যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। পূজ্য ভন্তে তো একাই যেতে পারেন না, তাঁর সঙ্গে অবশ্যই মানানসই পরিমাণ ভিক্ষুসঙ্ঘ যেতে হয়। সেই বিষয় বিবেচনা করে আমরা (যদ্দূর মনে পড়ে) বিশ/বাইশজন ভিক্ষু ও কিছু শ্রামণ ভন্তের সঙ্গে গিয়ে খাগড়াছড়িস্থ আর্যবন বিহারে বর্ষাবাস যাপনের সিদ্ধান্ত নিই। বলা বাহুল্য সেই বিশ/পঁচিশ জন ভিক্ষুর মধ্যে আমি বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলাম আর পূজ্য ভন্তের সেবক হিসাবে ছিলেন বিমলানন্দ ভিক্ষু। বর্ষাবাস সমাগত প্রায় হলে খাগড়াছড়ি এলাকাবাসীরা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে পূজ্য ভন্তেকে খাগড়াছড়িতে নিয়ে যেতে আসেন দলবেঁধে। ভন্তেও ৪ জুন, রোজ শুক্রবারে রাজবন বিহার হতে খাগড়াছড়িস্থ আর্যবন বিহারে পদার্পন করেন। খাগড়াছড়িবাসী পুরো বর্ষাবাসব্যাপী মহা সমারোহে ভন্তেকে সেবা-পূজা করতঃ ভন্তের মুখনিঃসৃত নির্বাণ সুখের অপূর্ব স্নিগ্ধেভরা দুর্লভ ধর্মদেশনা শ্রবণ করে নিজেদেরকে ধন্য করতে থাকেন। সময় গড়িয়ে চলে দুরন্ত গতিতে। দেখতে দেখতে বর্ষাবাস সমাপ্ত হয়ে এল। এবার পূজ্য বনভন্তেকে ফিরে যেতে হবে তাঁর

আজীবন আবাসস্থল রাজবন বিহারে। খাগড়াছড়িবাসীদের মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। মনে মনে আফসোস্ হল– ইস্, কেন যেন সময়টা তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল। আরো কতো পুণ্যকর্মই–না সম্পাদন করার ছিল। তা' আর হয়ে উঠল না। যদি আরো কয়েকমাস পূজ্য ভন্তের একান্ত সান্নিধ্য পাওয়া যেতো, তাহলে অনেক পুণ্য অর্জন করতে পারতাম। যেন সময়ের ওপর রাগ হল তাদের, হে সময়! তুমি কী একটু দেরীতে শেষ হতে পারলে না। আমাদেরকে সর্বনাশ করতে বুঝি এতো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেলি! আমাদের সর্বনাশের ঘন্টা বাজানো ছাড়া তোমার কী আর কোন কাজ নেই। পূজ্য বনভন্তে প্রায় পাঁচ মাস খাগড়াছড়িতে অবস্থান করার হেতু সেখানকার মানুষের মনে ক্ষমা মৈত্রীভাব বর্দ্ধিত হয়ে তারা হিংসাবৃত্তি পরিহার করে ধর্মীয় আচরণে অনুপ্রাণিত হন। এবং তাতে পুরো খাগড়াছড়ি জেলায় সামগ্রিকভাবে সকলের মঙ্গল, কল্যাণ সাধিত হয়। অতঃপর বর্ষবাস যাপনের পর একই বছরের ৬ নভেম্বর, রোজ শনিবারে তাঁর আজীবন আবাসস্থল রাজবন বিহার রাঙ্গামাটিতে প্রত্যাবর্তন করেন। মনে পড়ে, সেদিন খাগড়াছড়িবাসীরা ছলছল চোখের পানি ফেলে ভন্তেকে বিদায় দিয়েছিলেন। সেই থেকে বুঝা যায়, তারা কতো আন্তরিকভাবে পূজ্য ভন্তেকে গুরু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আন্তরিকভাবে গ্রহণ না করলে তারা কিছুতেই বিদায় বেলায় সেরূপ বিষাদের সুর তুলতে পারতো না। কারণ চোখের পানি রক্তের চেয়েও দামী। অন্যদিকে, সেদিন চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়সহ রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার পুণ্যার্থী দেড় শতাধিক মোটর যান (এসি পাজেরো, প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস ও কোস্টার) এবং অর্ধ শতাধিক স্কুটার; ব্যান্ডপার্টি সহযোগে বিশেষ শোভাযাত্রার মাধ্যমে বনভন্তেকে রাঙ্গামাটিতে ফিরিয়ে এনে সংবর্ধনা প্রদান করেছিলেন। যা অত্রাঞ্চলে ধর্মীয় ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত বা স্মরণকালের মোটর শোভাযাত্রা ছিল।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি, পূজ্য বনভন্তের জন্য সেবক নিয়োগ করাটা পূজ্য ভন্তে কর্তৃক বা ভিক্ষুসঙ্ঘ কর্তৃক মনোনীত করা হতো না। একেকজন একেক সময় নিজে উদ্যোগী হয়ে প্রধান সেবকের দায়িত্ব পালন করতেন। এতে অনেক সময় ভন্তেকে সেবাকার্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করা বিঘ্ন ঘটতে দেখে ২০০১ সালে রাজবন বিহারের আবাসিক ভিক্ষুসঙ্ঘ সর্বসম্মতিক্রমে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্তটি হল, এবার হতে ভিক্ষুসঙ্ঘ কর্তৃক মনোনীত করে দেওয়া হবে কে হবেন পূজ্য ভন্তের প্রধানসেবক। আর পূজ্য ভন্তেকে সেবাকার্য পরিচালনা করার জন্য তাকে সর্বসময় ক্ষমতা প্রদান করা হবে। ভিক্ষুসঙ্ঘ তাকে সেকাজে সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করতে দায়বদ্ধ থাকবেন। এবং পূজ্য বনভন্তের প্রধানসেবকের পদটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে সেবক ভিক্ষুকে হতে

হবে সেবাকাজে নিপুণ, নিরলস ও কর্তব্যপরায়ণ। সেরূপ সিদ্ধান্তের পর ভিক্ষুসঙ্ঘ আনন্দমিত্র ভিক্ষুকে পূজ্য বনভন্তের প্রধানসেবকের পদে মনোনীত করেন। সেসময় আনন্দমিত্র ভিক্ষু পানছড়িস্থ তারাবন অরণ্য কুটিরে অবস্থান করছিল। ভিক্ষুসঙ্ঘ সেখানে গিয়ে তাকে সেবিষয় অবগত করলে সে বিনয়ের সাথে বলে, 'তার আরো ভাবনা করে যাবার ইচ্ছা রয়েছে'। তবে বলে রাখে, তার সে ইচ্ছার যদি অন্যথাভাব উদয় হয়, অবশ্যই রাজবন বিহারে এসে সেবকের পদে নিযুক্ত হয়ে নিজেকে ধন্য করে নিবেন। অতঃপর ভিক্ষুসঙ্ঘ আয়ুষ্মান বিধুর ভিক্ষুকে পূজ্য বনভন্তের প্রধান সেবক মনোনীত করেন। সঙ্ঘ কর্তৃক মনোনীত হয়ে বিধুর ভিক্ষু পূজ্য বনভন্তেকে সেবা করার দুর্জয় মনোবল ও প্রগাঢ় ভক্তি–শ্রদ্ধা সহকারে নিজের সম্মতি প্রকাশ করে। আর এ'বলে ভিক্ষুসঙ্ঘের কাছে আবদার রাখেন, যেহেতু মাননীয় সঙ্ঘ সর্বপ্রথম আনন্দমিত্র ভিক্ষুকে পূজ্য ভন্তের প্রধানসেবকের জন্য মনোনীত করেছিলেন এবং তিনিও পরবর্তীতে সেই পদ গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, তাই আমি তিনি আসলে তাকে এই পদ ছেড়ে দিবো। আয়ুষ্মান বিধুর ভিক্ষুই হল সর্বপ্রথম সঙ্ঘ কর্তৃক মনোনীত করে দেওয়া পূজ্য বনভন্তের প্রধানসেবক। ভিক্ষুসঙ্ঘও তাতে সম্মতি প্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুসঙ্ঘ পূজ্য বনভন্তের সকাশে গিয়ে বিধুর ভিক্ষুকে পরিচয় করে দিয়ে সাংঘিকভাবে ভান্তের সেবক নিয়োগ করে দেওয়ার কথাটিও ভন্তেকে অবগত করান, প্রার্থনা সহকারে অনুমোদন করে নেন। অতঃপর ভিক্ষুসঙ্ঘ উচ্ছ্বাসবাক্যে বলে ওঠেন– "আমাদের মধ্যে আপনিই পূজ্য ভন্তের প্রধানসেবক হবার সৌভাগ্যবান সত্ত্বা। সেদিনটি ছিল ২০০১ সালের ১১ জানুয়ারী, রোজ বৃহস্পতিবার। আয়ুষ্মান বিধুর ভিক্ষু পরম নিষ্ঠার সাথে বছর দেড়েক প্রধান সেবকের দায়িত্ব পালন করার পর আনন্দমিত্র ভিক্ষু তারাবন অরণ্য কুটির ত্যাগ করে রাজবন বিহারে চলে আসেন। কাল বিলম্ব না করে বিধুর ভিক্ষু পূজ্য বনভন্তের প্রধানসেবকের দায়িত্ব আনন্দমিত্রকে নিয়োগ দেওয়ার অনুরোধ করেন ভিক্ষুসঙ্ঘকে। ভিক্ষুসঙ্ঘও তৎকালিন পূজ্য বনভন্তের প্রধানসেবক বিধুর ভিক্ষুর কথামত আয়ুষ্মান আনন্দমিত্র ভিক্ষুকে সর্বসম্মতিক্রমে পূজ্য বনভন্তের প্রধানসেবক হিসাবে মনোনীত করেন। আর পূজ্য ভন্তের কাছে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করে দেন। পূজ্য ভন্তেও জেনে যান এবার হতে আনন্দমিত্র ভিক্ষুই হবে তাঁর প্রধানসেবক। সেই হতে আজ অবধি আনন্দমিত্র ভিক্ষু পূজ্য ভন্তের প্রধানসেবকের পদে নিয়োজিত রয়েছেন।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে– দেহ হল ব্যাধির মন্দির স্বরূপ। সব সময় ছোট ছোট সাময়িক রোগ ভোগ ছাড়াও একটা না একটা দুশ্চিকিৎসা রোগ মানবের কাছে বিদ্যমান থাকে। এই রোগ যন্ত্রণা হতে কারোর অব্যাহতি নেই। অবধারিত এই সত্যে সবাই এক ও অভিন্ন নীতিতে

আবদ্ধ। ২০০৪ সালে দেব–মানবের পূজ্য বনভন্তের বাম চোখে ছানি ধরা পড়ে। ডাঃ সুমেধ দেওয়ান, কনসালটেন্ট (কর্নিয়া) চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পাহাড়তলী ও ডাঃ কনিষ্ক চাকমা পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে রেজাল্ট জানালেন, অবশ্যই ভন্তের চোখটি অপারেশন করতে হবে। অপারেশন ছাড়া চোখের ছানি সরানো যাবে না। আর যতদ্রুত সম্ভব সেটা করা সমুচিত। অতঃপর ভিক্ষুসঙ্ঘ, স্থানীয় ডাক্তারবৃন্দ ও দায়ক–দায়িকা মিলে একটি মিটিং করা হয়। মিটিং শেষে সবাই মিলে ভন্তেকে সেই বিষয় অবগত করানো হয়। পূজ্য ভন্তে সোজাসাপ্টা বলে দিলেন–সাধারণের মতো তিনি হাসপাতালে গিয়ে এবং বাংলাদেশি ডাক্তার দিয়ে অপারেশন করবেন না । এমন কি দেশের বাইরে গিয়েও অপারেশন করবেন না। ফলে বিদেশি ডাক্তার এনে রাজবন বিহারে অপারেশন করানোর যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর দঃ কালিন্দিপুর নিবাসী বাবু সুশোভন দেওয়ান (ববি)কে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হল। ববি বাবু চন্দ্রঘোনা মিশনারি হাসপাতালের পরিচালক ডাঃ মং স্টিফেন ও সার্জন ডাঃ রঞ্জিত চাকমার সাথে যোগাযোগ করেন। তাদের কাছ থেকে ন্যায়নিষ্ঠ সহযোগিতা পেয়ে এদিক–ওদিক দৌড়াদৌড়ি করে পূজ্য ভন্তের কথামত রাজবন বিহারে, বিদেশি ডাক্তারের মাধ্যমে ভন্তের চোখ অপারেশন করার যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করে নেন সাফল্যের সাথে। এ'ব্যাপারে তাকে ডাঃ মনীষা চাকমা, ডাঃ উদয়শংকর দেওয়ান, ডাঃ পরেশ খীসাও যথেষ্ট সাহায্য করেন। অপারেশনের তারিখ নির্ধারিত হল ৩০ নভেম্বর, রোজ মঙ্গলবার। একদিন আগে নানা শাখা বন বিহার থেকে ভন্তের সিনিয়র শিষ্যসহ অন্যান্য ভিক্ষুসঙ্ঘ, দায়ক–দায়িকাবৃন্দ রাজবন বিহারে এসে উপস্থিত হলেন। খুব ভোরে (সাড়ে তিনটায়) ঘুম ভাঙ্গল আমার। জেগেই মনের মধ্যে একটা শিহরণ ধাক্কা দিল। আজ পূজ্য বনভন্তের বাম চোখের ছানি অপারেশন হবে। ভন্তে আগের মতো ভালোভাবে, নিরুপদ্রবে দেখতে পাবেন; একথা ভাবতেই বেশ খুশি, আনন্দের পরশমাখা অনুভূতি হচ্ছিল আমার সারা শরীরে। আবার, অপারেশন শব্দটা মনে উঠতেই সামান্য টেনশনও পেয়ে বসল আমাকে। দু'য়ে মিলে তখন মনের অবস্থা ঠিক কী হয়েছিল তা' আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। "জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক, পূজ্য ভন্তের চোখ অপারেশন সুষ্ঠু ও ঝঞ্ঝাটমুক্ত হোক"–এ রূপ জপে জপে বিছানা ছেড়ে উঠি। উঠে দেখি, এখনও আকাশ ফর্সা হয়ে ওঠেনি। অন্ধকারাচ্ছন্ন আছে চারিদিক। ভোরের ঠান্ডা বাতাস ভেসে আসছে থেমে থেমে। অল্পক্ষণের মধ্যে আকাশের চেহারা পাল্টালো। ভোরের আলো ফুটতেই ফুড়ুত করে চারিদিক নির্মল হয়ে উঠল, সূর্যের নরম আলোর আঁচে পুরো আকাশ চকচক করতে লাগল। উজ্জ্বল আকাশের স্নিগ্ধরূপ দেখে মন প্রসন্ন হয়ে উঠল। এক ধরনের পবিত্র আবেগ নিয়ে পূজ্য ভন্তেকে সকালের বন্দনা করতে তাঁর

আবাসিক ভবনের দোতলায় গেলাম। ইতোমধ্যে বহু ভিক্ষু-শ্রামণের উপস্থিতিতে ভন্তের আবাসিক ভবনের দোতলা সরগরম হয়ে উঠেছে। ভন্তে উপস্থিত ভিক্ষু-শ্রামণকে কিছুক্ষণ ধর্মদেশনা প্রদান করেন। অতঃপর হালকা প্রাতঃরাশ সেরে নেন। সময় গড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষু-শ্রামণ, দায়ক-দায়িকারা ভিড় জমাতে থাকেন পূজ্য ভন্তের আবাসিক ভবনের সামনের সবুজ চত্বরে। সবাই মৌন নিথর, উৎসুকদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন কখন ভন্তে দোতলা হতে নেমে এসে (অস্থায়ী) *O. T* রুমে চলে আসবেন । বলে রাখা উচিত, পূজ্য ভন্তের ভোজনালয়টি (অস্থায়ী) *O. T* রুম বানানো হয়েছে। অপারেশন কার্য সম্পাদন করার যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে। আর অপারেশন কার্যে নিয়োজিত থাকার ডাক্তারের টিমটি গঠন করা হয়েছে এভাবে *Dr. Andrew Braganza, Professor, Department of ophthalmology, Christian Medical College, Vellore, Dr. Maung Stephen Chowdhury–Director, Chandragona Mission Hospital, Dr, Subhas Chakma, Anaesthetist, Chittagong Medical College Hospital, Dr. Konisko Chakma, Eye Specialist, Dr. Supriya Barua, Director (Retired) Dhaka... Hospital, Dr. Ranjit Chakma, Surgen Chandragona Mission Hospital* এবং অপারেশনের সময় ভন্তের সুবিধা-অসুবিধা দেখভাল করার জন্য *O. T* রুমে পাশের রুমে সর্বাক্ষণিক সর্তক থাকার জন্য ভন্তের প্রধানসেবক আনন্দমিত্র ভিক্ষু, আমি ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ডাঃ উদয়শংকর দেওয়ান, ডাঃ নিখিল চন্দ্র বড়ুয়া, ডাঃ রবিন চাকমা, বাবু সুশোভন দেওয়ানকে নিয়ে অপর একটি টিম গঠন করা হয়েছে। ঘড়ির কাটা সকাল নয়টা সীমা ছুঁই ছুঁই করতেই বিদেশি ডাক্তার বহনকারী গাড়িটি মেইন বিহার কম্পপ্লেক্স- এর ভেতর ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত ভিক্ষু-শ্রামণ, দায়ক-দায়িকাবৃন্দ নড়েচড়ে উঠল। সবার চোখ, কান টানটান হয়ে উঠল নিমিষেই। খুশি ও উত্তেজনার একটা ছায়া সবার শরীরে। কিছুক্ষণ পর ভন্তেকে হুইল চেয়ারে করে দোতলা থেকে নীচে নেমে এনে অপারেশন রুমের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সে সময় সমবেত ভিক্ষু-শ্রামণ, দায়ক-দায়িকারা দু'হাত জোড় করে সাধুবাদ দিতে দিতে ভন্তেকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ভন্তেকে অপারেশন রূমে ঢুকানো হয়। ডাক্তার টিমের সাথে আনন্দমিত্র ভিক্ষু এবং আমিও ঢুকে পড়লাম। আগেই উল্লেখ করেছি, কোন টিম কি দায়িত্ব পালন করবেন তা' নির্ধারিত ছিল। তাই আমরা মূল অপারেশন রূমে না ঢুকে পাশের রূমেই ছিলাম। তবে জানালার গ্লাস ভেদ করে আমরা স্পষ্ট দেখতে পেতাম *O. T* বেডে শায়িত ভন্তেকে বা অপারেশন কার্য সবই। এ্যানেস্টেশিয়া প্রয়োগ করার আগে ভন্তেকে *O. T* বেডে শুয়াইয়ে দিলে তিনি হুট করে উঠে বসতে চেষ্টা করেন। কিন্তু *Dr. Subhas (Anesthetist)*

এ্যানেস্থেশিয়া প্রয়োগের পর অবচেতন হয়ে পড়েন ভন্তে। আর *Dr. Andrew* কুশলী হাতে সফল অপারেশনের কাজে মনোযোগী হন। তখন ঘড়ির কাটা বলে দিচ্ছিল, সকাল সাড়ে নয়টা বেজেছে। এ'কাজে তাকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন *Dr. Konisko Chakma* ও *Mr. Anup Biswas,* বিশেষ সহযোগী হিসাবে সহযোগিতা করেন *Dr. Maung Stephen Chowdhury, Dr. Supriya Barua, Dr. Ranjit Chakma* । আর আমরা পাশের রূম থেকে জানালার গ্লাস ভেদ করে তীক্ষ্মদৃষ্টিতে, দুরু দুরু বুকে অপারেশন করার প্রতিটি মুহূর্ত অবলোকন করতে থাকি। পিনপতন নীরবতা যেন। সবার মুখ গম্ভীর, কারোর মুখে কোন কথা নেই। প্রত্যেকের বুকে যেন ভন্তের জন্যে গভীর কষ্টের উত্তাপ জ্বলছিল। সবাই চাতকের মতো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকি কখন অপারেশন শেষ হবে। মাঝে মাঝে ডাঃ উদয়শংকর দেওয়ান আমাদের সঙ্গো দু'একটা কথা বলতেন। আমাদেরকে বলা হয়েছিল অপারেশন শেষ হতে এক/দেড় ঘন্টা লাগতে পারে। কিন্তু সেই সময় অতিক্রম হয়ে গেলেও অপারেশন শেষ হচ্ছিল না। হঠাৎ দেখি আনন্দমিত্র ভিক্ষুর দু'চোখের কোণে জল চিকচিক করছিল। তার সে অবস্থা দেখে আচম্বিতে আমার বুকও কেঁদে উঠে। মনের মধ্যে একটা বেদনাশ্রয়ী সুরের গুঞ্জন হচ্ছিল স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম। অনেক চেষ্টার পর নিজেকে শান্ত করতে সমর্থ হই। ঐদিকে বাইরে অপেক্ষমান ভিক্ষু–শ্রামণ, দায়ক–দায়িকারাও যে দুরু দুরু বুকে, বেশ আশঙ্কায় ছিলেন সে কথা বলাই বাহূল্য। এক সময় কেউ যেন আমাদের উদ্দেশ্যে বলেন, ভন্তে আপনারা খেতে আসেন। আপনাদের খাবার সময় শেষ হতে চলেছে। শব্দটা শুনে ঘড়ির দিকে তাকাতেই দেখি ১১টা ৪৫মিনিট। সঙ্গো সঙ্গো আমি বলে দিলাম– না, আজ খাবো না। ভন্তের চোখ অপারেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে নড়ছি না। আনন্দমিত্রও আমার কথায় সায় দিল। বারটা বেজে যাবার পর *Dr. Andrew, Dr. Stephen, Dr. Konisko, Dr. Supriya, Dr. Ranjit* সহাস্যমুখে *O. T* রূম থেকে বেরিয়ে আসেন। আর স্মিত হাসিমাখা মুখে *Dr. Andrew* বলেন *"Operation Succeed". Dr. Andrew*–এর মুখ হতে এ'শুভ সংবাদ শুনে সে মুহূর্তে নিজেদেরকে পৃথিবীর সব চাইতে সুখী মানুষ বলে মনে হয়েছিল আমার। সঙ্গো সঙ্গো *O. T* রূমে ঢুকে পড়ি আমরা। দেখতে পায়, পূজ্য ভন্তে অপারেশন সিটে শুইয়ে আছেন, বুকে সাদা কাপড়, চোখে ব্যান্ডিস লাগানো। তখনও এ্যানেস্থেশিয়ার ঘোর কেটে চেতন হয়ে উঠেননি ভন্তে, অবচেতন অবস্থায় ছিলেন। আরো প্রায় বিশ/পচিশ মিনিট অপেক্ষা করার পর ভন্তে আস্তে আস্তে নড়েচড়ে উঠেন, চেতন ফিরে পান। চেতন ফিরে পাবার পরও পৌণে এক ঘণ্টার মত ভন্তেকে অপারেশন রূমে রাখা হয় পূর্ণ

বিশ্রামের জন্যে। অবশেষে বেলা দুইটার পর পূজ্য ভন্তেকে খুব সর্তকতার সাথে তাঁর আবাসিক ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়।

দেখতে দেখতে কেমন যেন সময় চলে যায়। পরিবর্তন হয় অনেক কিছুর। শুধু বস্তুগত পরিবর্তন নয়, পরিবর্তন হয় মনের, চিন্তা–চেতনার, পরিকল্পনারও। ১৯৯৪ সাল হতে ২০০৫ সাল, মাত্র এগার বছরের মধ্যে আমাদেরকে আবার নতুন করে পূজ্য বনভন্তের আবাসিক ভবন নিয়ে ভাবতে হচ্ছে, পরিকল্পনা করতে হচ্ছে। কারণ বর্তমান সময়ের চাহিদা অনুযায়ী সেই আবাসিক ভবনটি অপর্যাপ্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং যেভাবে দেশ–বিদেশ থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের উচ্চতম সন্মানজনক রাষ্ট্রনেতা, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, জ্ঞানী–গুণীজন পূজ্য ভন্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন, সেই হিসাবেও বর্তমান ভবনটি মানানসই দেখায় না। সেসব বিষয় বিবেচনা করে পূজ্য ভন্তের জন্য আরো একটি আকর্ষণীয়, সুন্দর স্থাপত্য শৈলীসমৃদ্ধ এবং আধুনিক সুযোগ–সুবিধাসম্পন্ন ভবন নির্মাণ করে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেই ভবন নির্মাণের জন্য স্থান নির্ধারিত হয় ১৯৯৪ সালে নির্মিত ভবনের পিছনের খালি জায়গাটি। আর *Disha design Associates, Chittagong*–এর সাথে ভবনের নকশা তৈরী ও নির্মাণকাজ তত্ত্বাবধান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাঙ্গামাটির স্বনামধন্য স্থপতি মিসেস রীতা চাকমা উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে দিয়ে নিজেকে পুণ্যের ভাগী করেন। যথাসময়ে প্রতিষ্ঠানটি নতুন ভবনের নকশা তৈরী করতঃ ভিক্ষুসঙ্ঘের সামনে উপস্থাপন করে। ভিক্ষুসঙ্ঘও প্রয়োজনীয় সংশোধন এনে নকশাটি অনুমোদন করেন। ১৪ জানুয়ারী ২০০৬ সাল, রোজ শুক্রবার নতুন ভবনের নির্মাণকাজ শুরু হয়। ভবনটি দৈর্ঘ্যে ৮৬ ফুট, প্রস্থে ২৯ ফুট। আর দক্ষিণদিক থেকে ভবনটি দ্বিতল বিশিষ্ট হলেও উত্তরদিক থেকে এটি চারতলা সমান। প্রথমদিকে ভবনের পরিধি আরো বিস্তৃত করার চিন্তা থাকলেও সুবিধামত খোলা জায়গা না থাকায় সেটা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আপামর জনসাধারণের স্বতঃস্ফুর্ত শ্রদ্ধাদানের অর্থে নতুন ভবনের নির্মাণকাজ ত্বরান্বিত হতে থাকে। তারা ন্যূনতম পঞ্চাশ, একশত টাকা হতে শুরু করে লক্ষ টাকাও দান দিতে এগিয়ে আসে। অনেকে ব্যক্তিগত পর্যায়েও নির্মাণসামগ্রী যেমন ইট, বালি, লৌহ, সিমেন্ট দান দেন। ভবনটির নির্মাণকাজ আকর্ষণীয়, সুন্দর ও নিখুঁত সুনিশ্চিত করতে *Disha design Associates, Chittagong*-এর *Architect Ashis Chakma, B.Arch (Buet), Ingineer Md. Salim Raza, Ingineer in Civil, Ingineer Tiplu Sarkar, Ingineer. in Civil* নিরলস প্রচেষ্টা করে গিয়েছেন। মাঝে মাঝে *Architect Mrs Rita Chakma*ও তাদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেছেন। এছাড়া *Sub-Ingineer Doyel Chakma*ও যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। আর ভিক্ষুসঙ্ঘের

পক্ষ থেকে উক্ত কাজে সার্বিক সমন্বয় ও পরামর্শক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন যথাক্রমে ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, জিনলংকার ভিক্ষু, জিনপ্রিয় ভিক্ষু। বলা বাহূল্য সৌরজগত ভিক্ষুও এব্যাপারে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। ও হ্যাঁ, এ'নবনির্মিত ভবন নির্মাণকাজ সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে রাজমিস্ত্রি মোঃ আনোয়ার হোসেনও তার মিস্ত্রিজীবনের বহূ বছরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছেন সফলভাবে। পরম পূজ্য অর্হৎ বনভন্তের অগণিত ভক্ত, পূজারীগণের শ্রদ্ধাদানে মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে প্রায় কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিক স্থাপত্য শিল্পের ধাঁচে মনোমুগ্ধকর ভবনের নির্মাণকাজ সুসম্পন্ন হয়। নব নির্মিত ভবনের পুরো ফ্লোরটি গ্রানাইট পাথর দিয়ে আচ্ছাদিত। যা সব সময় চকচক করে বললে ভুল হবে না। ভবনের ভেতর ৬০ ফুট X ২৯ফুট বিশিষ্ট একটা বিরাট হলরুম। যেই হলরুমে ভন্তে দায়ক-দায়িকা, ভক্ত ও দর্শনার্থীদের সাক্ষাৎ দিবেন, ধর্মদেশনা প্রদান করবেন। তারপরে রয়েছে পূজ্য ভন্তের জন্য একটি বিশ্রামরুম, যেটি ২৯ ফুট X ১৪ ফুট পরিসরের। এখানে একটা লিফ্‌ট সংযুক্ত করা হয়েছে, যাতে ভন্তে রুম থেকে বের না হয়ে সরাসরি নীচে নেমে ভোজনালয়ে, দেশনালয়ে আসতে পারেন। বিশ্রামরুমের পাশেই রয়েছে ১৬ ফুট X ১৬ ফুট বিশিষ্ট শোয়ার রুম। এ'রুমের সাথে সংযুক্ত রয়েছে আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন বাথরুম। বিশ্রামের রুমে দুটি এবং শোয়াররুমে একটি প্রশস্ত করিডোর রয়ছে। যাতে পূজ্য ভন্তে ইচ্ছা করলে করিডোরে এসে মুক্তবাতাস সেবন করতে পারেন। বিশ্রামরুম এবং শোয়াররুম দু'টির ভেতর ও বাইরের ওয়ালে লাগানো হয়েছে আকর্ষণীয় টাইলস্। প্রতিটি রুমে রয়েছে একটি করে এয়ারকন্ডিশন। বিশাল হল রুমটি মূল ভবনের ন্যায় পূর্ব-পশ্চিমদিকে লম্বালম্বি পরিসরের। আর হলের পূর্বদিকের একেবারে শেষ বিন্দুতে রয়েছে পূজ্য ভন্তে বসার জন্য একটি আকর্ষণীয় আসন। আসনটি পশ্চিমদিকে মুখ করে বসানো। বলা বাহূল্য, হল রুমটির তিনদিকই খোলা, কেবল পূর্বদিকে দেয়াল রয়েছে। উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিমদিকে কোন দেয়াল নেই; থাইগ্লাসই লাগানো হয়েছে। তবে গ্লাসগুলো *Fix* নহে। প্রতি পনের ফুট পর পর দশ ফুট বিশিষ্ট একটি করে দরজা রাখা হয়েছে। আর থাইগ্লাসের পর আকর্ষণীয়ভাবে স্টিলের রেলিং দেয়া হয়েছে। ও হ্যাঁ, একটা কথা বলা দরকার, হলের উত্তরদিকের থাইগ্লাস সরিয়ে করিডোরে বের হয়ে যে কোন জন মনভরে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য অবলোকন করতে পারবেন এক নিমিষে। এবং প্রকৃতির সেই অপার দৃশ্য উপভোগ করতে করতে হঠাৎ মন-প্রাণ উদাস হয়ে পার্থিব টানাপোড়নের বাইরে চলে যেতে সক্ষম হবেন। ভবনের পশ্চিমদিকে রয়েছে মূল প্রবেশ পথ। যে পথ বেয়ে বেয়ে দায়ক-দায়িকা, ভক্ত, দর্শনার্থীরা ভন্তের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। অবশ্য সে প্রবেশ পথের সিঁড়িটি ভবনের সম্মুখ দিকও বটে। অন্যদিকে, ভন্তের আসন বরাবর দক্ষিণদিকে

পুরানো আবাসিক ভবনের সাথে আরো একটা সংযোগ পথ রয়েছে, যেটা দেখতে ফ্লাইওভারের ন্যায়। তবে এটি সাধারণত পূজ্য বনভন্তে ও ভিক্ষু-শ্রামণের জন্য সংরক্ষিত বলা চলে। এটা অস্বীকার করার জো নেই যে, রাঙ্গামাটি (তিন পার্বত্য জেলা)-তে এটিই প্রথম লিফ্‌ট (?)। পূজ্য বনভন্তের এই নতুন ভবনে লিফ্‌ট লাগানোর আগে রাঙ্গামাটিতে কোথাও কেউ লিফট লাগিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। সবকিছু মিলে বলা যায় পূজ্য ভন্তের জন্য নির্মিত এই নব ভবনটি বেশ আধুনিক, আকর্ষণীয় ও মনোরম। আজ পবিত্র বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সেটি পরম পূজ্য ভন্তেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দান করা হবে। আর ভন্তেও আজ হতে সেখানে অবস্থান করবেন। তখন পুণ্যকামী দাতাদের অন্তর ভক্তিতে কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়ে উঠবে। তাদের মনে এক অনাবিল সুখানুভূতিতে উচ্ছ্বাসিত হবে **'সার্থক হয়েছে, ধন্য হয়েছে আমাদের এদান'** বলে।

☞ অপ্রমাদে রত হও, স্বীয়চিত্তকে সাবধানে রক্ষা কর এবং আপনাকে পঙ্কে (কাদায়) মগ্ন কুঞ্জরের (হাতির) ন্যায় নিজেকে দুর্গতি (চারি অপায় অর্থাৎ নরক, তির্যক, প্রেত ও অসুর) থেকে রক্ষা কর।

নাগবর্গ, ধর্মপদ।

রাঙামাটির বৈচিত্র্য ও পুণ্যতীর্থ রাজবন বিহার

শ্রীমৎ আদিকল্যাণ ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

বাংলাদেশে দক্ষিণ–পূর্বাঞ্চলে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান তিনটি জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম গঠিত হয়। তন্মধ্যে রাঙ্গামাটি জেলা অন্যতম। এমনকি চাকমাদের রাজধানী বললেও অতুক্তি হবে না। যেহেতু চাকমারা অনেক আগে থেকে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে বসবাস করে আসতেছেন। সেই ১৮৯৭ সালে সর্বপ্রথম রাজা ভুবন মোহন রায় রাজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ১৯৩৪ সালে রাজা ভুবন মোহন রায়ের মৃত্যু হলে রাজা নলিনাক্ষ রায় ১৯৩৪ সালে রাজ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। কর্মের নির্মম পরিণতিতে ১৯৫১ সালে যখন নলিনাক্ষ রায়ের মৃত্যু হয় তখন রাজা ত্রিদিব রায় ১৯৫৩ সালে শাসনভার গ্রহণ করেন। রাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তানে চলে যাবার (দীর্ঘদিন) পর রাজকুমার ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায় ১৯৭৭ সালে রাঙামাটি জেলার শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আর বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী পদে দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

মনে পড়ে সেই ছোট্ট বেলার ফেলে আসা ছোট ছোট দিনগুলির কথা। দিন শেষে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা যখন নামে বাড়ির উঠানে পাটি বিছায়ে নানা–নানু আমাদেরকে শোনাতেন হঅ্বী–ধবী, রাধামন–ধনপুদির পজ্জন বা গল্প। শোনাতেন রাঙামাট্যের রাঙা গল্প। তখনকার সময়ে রাজাদের রাজপুণ্যাহ চাকমাদের বৈচিত্র্যময় বিঝু মেলাতে ঘিলা খেলা, লাতিম মেলা ও বলি খেলার উৎসবের কথা। নানা বলতেন– বিঝু মেলাতে বাজারে গেলে চার আনা–আধ আনা পয়সা দিয়ে অনেক কিছু জিনিসপত্র পাওয়া যায়। আর আমরা সেই গল্প শুনে শুনে কল্পনার বিভোরে নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম। রাত যত এগুতে থাকে গ্রাম ততই নীরব–নিঃস্তব্দ হয়। আর চাঁদ মামাও সময়ের সাথে সাথে আমাদের ঠিক মাথার উপর কখন যে এসে পড়ে খেয়ালই থাকে না। পৃথিবী তখন চাঁদের আলোতে আপন সাজে সজ্জিত হয়। মিটিমিটি করে জোনাকি পোকারা আমাদের চারপাশে ঘুরতে থাকে। একটি দুইটি করে অনন্ত আকাশের বুকে লক্ষ লক্ষ তারা (*Star*) উদিত হয়। আর আমরা যখন তারার সংখ্যা এক, দুই করে গুণতে থাকি তখন নানা–নানু বলতেন এভাবে তারার সংখ্যা গুণতে নেই। সব তারার সংখ্যা গুণতে না পারলে বনের বাঘে খেয়ে ফেলবে। তখন আমরা চুপ করে নানা–নানুর কোলের মধ্যে বসে পড়তাম। নানু আকাশের দিকে হাত উচিয়ে বলতেন দেখো ঐ চাঁদের ভিতরে বুড়া আর বুড়ী ঢেঁকি দিয়ে ধান বাড়তেছেন আর কালো একটি কুকুর ধানের তুষ (ভুচি) খাচ্ছে। তখন আমরা

এক দৃষ্টিতে হয়ে দেখার চেষ্টা করি। কিন্তু কিছুই দেখা যায় না। এভাবে রাঙামাট্যার রাজগল্প শুনতে শুনতে কখন যে ঘুম এসে আমাদেরকে বেঁধে ফেলে জানাই থাকে না। কিন্তু নানু আজ নেই নানা এখনও বেঁচে আছেন তাঁর বয়স নাকি ১১০ বছর। ১৯৬১ সালে যখন কাপ্তাই লেকে বাঁধ দেয়া হয় তখন তাঁরা রাঙামাটি শহরের পার্শ্ববর্তী কান্দবছড়া নামক গ্রাম ছেড়ে খাগড়াছাড়ি জেলার পানছড়ি থানার পূজগাং-এ চলে যান। যেটি প্রায় ভারতের সীমান্তের কাছাকাছি। তাই আজো সেই ছোট কালের দিনসমূহ মাঝে মাঝে হৃদয়ে দোলা দেয়।

কিন্তু সময়ের বিবর্তনে রাঙামাট্যা তার সেই পুরনো নিজস্ব বৈচিত্র্যময় চেহারা হারিয়ে আজ নতুন সাজে নিজেকে সাজিয়ে নিয়েছে। স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পর্যায়ক্রমে গড়ে উঠেছে। শিক্ষায়-সুশিক্ষিত জ্ঞানে গুণীয়ান হতে লাগলো মানুষজন। যা আর বলার অপেক্ষা করে না। কিন্তু তারপরেও এখানকার পার্বত্যবাসী মানুষ আজ যার কথা বলে, যার কথা না বললে জীবন একদিনও চলে না। সেই মহান পূজনীয় ব্যক্তি হচ্ছেন বৌদ্ধকুল গৌরব, বৌদ্ধধর্মের ধারক-বাহক শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভান্তে)। তিনি ১৯২০ সালে ৮ জানুয়ারীতে রাঙামাটি সদর উপজেলার মোরঘোনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা- হারুমোহন চাকমা এবং মাতা- বীরপুদি চাকমা। এই অঞ্চলের বৌদ্ধরা আজ গর্বিত (গৌরবান্বিত), আনন্দে প্লাবিত। ছায়া ঘেরা সবুজ বনানী বেষ্টিত পুণ্যক্ষেত্র (পুণ্যকেন্দ্র) এই রাজবন বিহার সবারই মন কেড়ে নেয়। প্রতিদিন হাজার হাজার পূণ্যার্থীর সমাগম হয় আর সাথে অগণিত দর্শণার্থী (পর্যটক)। পুণ্যার্থীরা পূজ্য বনভান্তের মৈত্রী-করুণার বাণী শ্রবণ করে মনের আনন্দে ফিরে যায় তাদের নিজ নিজ বাসস্থলে। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন- গ্রামে কিংবা অরণ্যে, নিম্নে কিংবা উচ্চ ভূমিতে যেখানে মহৎগণ অবস্থান করেন সে স্থানই রমণীয়। সর্বস্তরের মানুষ প্রতিনিয়ত ইহকাল ও পরকাল সুখের জন্য বুদ্ধমূর্তি দান, সংঘ দান, অষ্ট পরিষ্কার দান, পিন্ডদান বিবিধ দান করে যাচ্ছেন। নিত্য পুণ্যের চাষ, মৈত্রীর চাষ, জ্ঞানের চাষ করা হচ্ছে পুণ্যভূমি এই রাজবন বিহারে। মহাপুরুষের জন্ম জগতের কল্যাণের জন্যই হয়ে থাকে। তাই যখনই তাঁরা আবির্ভূত হন বহুলোক তাঁদের শান্তিছায়ায় আশ্রয় নিয়ে তৃপ্ত ও সুখি হয়। তাঁদের উপদেশ, নির্দেশে নিজের কল্যাণের পথ খুঁজে পায় আর পরিণামে মুক্তি লাভ করে।

ভগবান তথাগত গৌতম বুদ্ধের জীবদ্দশায় বারাণসীতে নন্দিক নামে এক বণিক ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাবান উপাসক ছিলেন। নন্দিক ক্রমে দানপতি হয়ে নিত্য দান অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতেন। প্রতিনিয়ত দীন-দু:খী ও পথিকদের ভোজনের ব্যবস্থা করতেন। এক সময় তিনি ঋষিপতন মৃগদাবে চারি প্রকোষ্ঠ যুক্ত একটি বিহার তৈরী করে তাতে পালংক শয্যাদিসহ

ভিক্ষুর উপকরণসহ বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করেন। দান করার সাথে সাথে তার জন্য তাবতিংস দেবপুরে দৈর্ঘ্য প্রস্থ দ্বাদশ যোজন উচ্চতার শত যোজন সপ্ত রত্নময় এবং অপ্সরা-অপ্সরী সমাকীর্ণ দিব্য প্রাসাদ আবির্ভূত হলো।

এক সময় মহাঋদ্ধিশালী মোগ্গলায়ন ভান্তে দেবপুরে ভ্রমণকালে সে নতুন দিব্য প্রসাদ দেখলেন, সেই প্রাসাদে বেড়াতে গিয়ে দেবপুত্রগণ তাঁকে বন্দনা করে বললেন– ভান্তে প্রভূ! বারাণসীর নন্দিক নামে একজন উপাসকের জন্য এ প্রাসাদ উৎপন্ন হয়েছে আর আমরা তাঁর পরিচারিকা দেবপুত্র ও অপ্সরীগণ তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছি। প্রভূ! আপনি মনে হয় সেখানে যাবেন। তাঁর তৈরী করা বিহার ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করে সে পুণ্য ফলে এ প্রাসাদ উৎপন্ন হয়েছে। যদি সেখানে গিয়ে থাকেন নন্দিককে সহসা আসতে বলবেন। মোগ্গলায়ন ভন্তে সাধুবাদের সাথে বিদায় নিলেন।

মোগ্গলায়ন ভন্তে দেবলোক হতে পৃথিবীতে ফিরে এসে চারি পরিষদের মধ্যে (অর্থাৎ ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা) ভগবান বুদ্ধকে বন্দনা করে বললেন– প্রভূ! পুণ্যবানেরা ইহলোক থাকতে দেবলোকে তাঁর জন্য দিব্য সম্পত্তি উৎপন্ন হয় কি?

ভগবান বুদ্ধ বললেন– মোগ্গলায়ন, তুমি দেবলোকে গিয়ে নন্দিকের দিব্য সম্পত্তি নিজেই দেখনি? তা আবার জিজ্ঞাসা করছ কেন?

মোগ্গলায়ন ভন্তে বললেন– হ্যাঁ, ভগবান! দেখেছি।

তখন বুদ্ধ বললেন–

চিরপ্পবাসিং পুরিসং দূরতো সোত্থিমাগতং
ঞাতিমিত্তা সহজ্জা চ অভিনন্দতি আগতং
তথেব' কতপুঞ্ঞম্পি অস্মালোক পরংগতং
পুঞ্ঞাতি পতিগনহন্তি পিযং ঞাতী'ব আগতং।

অর্থাৎ দীর্ঘদিন প্রবাসী দূরদেশ হতে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করলে জ্ঞাতিমিত্র ও সুহৃদবর্গ যেমন তাঁর আগমনকে অভিনন্দন করে, তদ্রূপ পুণ্যবানও ইহলোক হতে পরলোকে গমন করলে তাঁর পুণ্যসমূহ আগত প্রিয়জ্ঞাতির ন্যায় তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে।

অহো! আজ এখানকার বৌদ্ধরাও কত ভাগ্যবান এমনি শুভ এই বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে পূজ্য বনভন্তের জন্য নির্মাণ করা সুন্দর মনোরম দ্বিতল বিশিষ্ট বাসভবনটি বনভন্তে প্রমুখ পবিত্র ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করছেন।

পরম শ্রদ্ধেয় বনভান্তের স্বপ্ন

শ্রীমৎ জ্ঞান জ্যোতি ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

২০০১ সালে আমি উপসম্পদা গ্রহণ করার পর থেকে আর্যশ্রাবক পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ধর্মদেশনা শুনার আমার সৌভাগ্য হয়। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলতেন, রাজবন বিহারে প্রেস প্রতিষ্ঠা করে, সমস্ত ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ করে ছাপানোর কথা। পালি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে পালি ও ত্রিপিটক শিক্ষা করার কথা। রাজবন বিহারে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা, ভিক্ষুসঙ্ঘ থেকে ডাক্তার হয়ে ভিক্ষু-শ্রামণকে চিকিৎসা করার কথা।

যাঁরা লোভ, দ্বেষ, মোহকে ক্ষয় করে অরহত্বফল লাভ করেন, তাঁদের কথা কখনও বৃথা হয় না। ঠিক তেমনি আর্যশ্রাবক পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তেও যে কথাগুলি বলেন, তা সবই সত্যি পরিণত হয়। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের স্বপ্ন ছিল রাজবন বিহারে প্রেস প্রতিষ্ঠা করা। তাই কয়েক বছর আগে রাজবন অফসেট প্রেস নামে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করে, শত শত ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। এ প্রেসটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে এখন ধর্মীয় বই সহজে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে। এক কথায় বলা যায় অনেক উপকার হয়েছে। যারা এসব ধর্মীয় বই প্রকাশ করছে, তারা অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে বই ছাপাতে সক্ষম হচ্ছে।

আর এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভান্তের স্বপ্ন ছিল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা। দীঘিনালা (বর্তমানে কাঁটা পাহাড়, তবলছড়ি, রাঙামাটি) নিবাসী বাবু কল্প রঞ্জন চাকমা (বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে) পার্বত্য শান্তিচুক্তির পর তৎকালিন বাংলাদেশ সরকারের (১৯৯৭-২০০১সালে) একজন পূর্ণ মন্ত্রী (শান্তিচুক্তি অনুযায়ী) পদে অধিষ্ঠিত হলে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সে স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড থেকে একটি প্রকল্প প্রদান করে হাসপাতাল ভবন প্রতিষ্ঠা করেন। যা বর্তমানে **"রাজবন হাসপাতাল"** নামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজবন বিহার ও অন্যান্য শাখা বন বিহার সমূহের ভিক্ষু শ্রামণ অসুস্থ হলে এখানে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়। ফলে বলা যায় আগের তুলনায় বর্তমানে রাজবন বিহার ও অন্যান্য শাখা বন বিহার সমূহের ভিক্ষু-শ্রামণদের চিকিৎসা সেবাও কিছুটা উন্নত হয়েছে। তাই রাজবন বিহার ও (সম্ভব হলে) অন্যান্য শাখা বন বিহার সমূহের ভিক্ষু-শ্রামণ অসুস্থ হলে রাজবন হাসপাতালে গিয়ে অবস্থান করে চিকিৎসা সেবা নিয়ে থাকে, আর সুস্থ হলে নিজ নিজ রুমে চলে আসে।

আরো ২০/২২ জন ভিক্ষুকে প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন শাখা বন বিহারে গিয়ে অসুস্থ ভিক্ষু-শ্রামণকে সেবা দেওয়ার জন্য। যারা ভাবনাকারী ভিক্ষু-শ্রামণ তারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন বন-জঙ্গালে ভাবনা করতে যায়। ফলে সেখানে তারা অসুস্থ হলে সহজে ডাক্তার পাওয়া যায় না। বর্তমানে যারা প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে তারা ভাল করে শিখতে পারলে শাখা বন বিহার সমূহেও চিকিৎসা সেবা উন্নত হবে।

পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের স্বপ্ন ছিল রাজবন বিহারে **"পালি কলেজ"** প্রতিষ্ঠা করা। পালি ভাষা শিক্ষা করে, সমস্ত ত্রিপিটকগুলিকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা। অবশ্য ইতোমধ্যে বিনয় পিটকের পাঁচ খন্ড বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। অন্যান্য খন্ডগুলিও অনুবাদের পরিকল্পনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে পালি ভাষাও শিক্ষা করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে পালি কলেজটি প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা ভাবনা আছে।

এ থেকে বুঝা যায়, আর্যশ্রাবক পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মুখে যা বলেন তা সত্যে পরিণত হয়। তিনি লোভ, দ্বেষ, মোহহীন একজন মুক্তপুরুষ। বলা যায় তাঁর মত দুর্লভ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ যারা লাভ করেছে তারা খুবই ভাগ্যবান ও পুণ্যবান। অবশ্য তাদেরকে দুর্লভ মানব জীবনকে সার্থক করতে হলে লেখাপড়া, শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি, ব্যাবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি ধর্মময় জীবন-যাপন (ধর্মচর্চা, শিক্ষা, অভ্যাস, আচরণ ও প্রতিপালন) করা একান্ত প্রয়োজন। যারা দুর্লভ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েও ধর্মকে যেভাবে আচরণ, প্রতিপালন করা প্রয়োজন আচরণ করছে না, তারা মানব জীবন পেয়েও সার্থক করতে পারবে না।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের স্বপ্নগুলি বাস্তবায়ন করতে হলে ভিক্ষু পরিষদ, উপাসক-উপাসিকা পরিষদকে সকল দ্বিধাদন্ড ভুলে গিয়ে মৈত্রীচিত্তে এক যোগে কাজ করতে হবে। আমরা যদি সবাই শ্রদ্ধেয় বনভন্তের উপদেশে চলতে পারি বুদ্ধের শাসন উজ্জ্বল হবে। আমাদের মধ্যে থাকবে না কোন দ্বিধাদন্ড, থাকবে না কোন হিংসাভাব। শুধু থাকবে ক্ষমা, মৈত্রী, আর সুখ-শান্তি।

☞ শীল প্রতিপালন কর, কাউকে অন্যায় ও ক্ষতি করবে না। –বনভন্তে।

☞ যতদিন পাপের ফল লাভ না করে ততদিন মূর্খ ব্যক্তি সেই পাপকে মধুময় (সুখময়) মনে করে, কিন্তু যখন পাপের ফল পরিপক্ক হয় তখন মূর্খ ব্যক্তিকে অনন্ত দুঃখ ভোগ করতে থাকে।

Significance Of The Buddha Purnima

By- Saranankar Bhikkhu
Rajban Vihar, Rangamati.

There are many holy ceremonies throughout the year, among them the Buddha Purnima is most important as well as significance festival in Buddhist world. Buddhist people celebrate this occasion to commemorate three important events, these are- the birth of the Buddha, his Enlightenment and his passing away. Nowadays, it is observed by the Buddhist in Bangladesh, Thailand, Sri Lanka, China, Japan, Korea, Mongolia, Laos, Cambodia, the UK, the USA, Canada and so many countries around the world. The Buddha Purnima is usually takes place on the full moon day of Baishakh (Approximately in May). On this day, Buddhist in some countries would take part in the ceremonial bathing of the Buddha Statues. They pour ladles of water scented with flowers petals over a statue of the Buddha. Actually, it is symbolizes purifying their hearts, mind and actions through the holy deeds. Every Buddhist community ought to have special celebrations on this day of triple anniversary of the greatest events in the life of our Lord Buddha, including public procession, illumination of temple and shrines as well as decorated with flowers, displays of Buddhist flags, and captive animals, such as birds, fishes and turtles are set free from their cages. This is a very joyous day for every Buddhist.

Now I am going to pen about the three greatest events of the Shakyamuni Buddha, commemorate on the occasion of the Buddha Purnima -

The Birth of the Shakyamuni Buddha:

The first greatest event of the Buddha Purnima is birth of the Shakyamuni Buddha.

A long time ago, there was a small kingdom called Sakya at the foot of the Himalayn Mountaains in modern Nepal. Kapilavatthu was its capital.

The King's name was Suddhodana. He belonged to the Sakya clan. The King had an attractive wife whose name was Queen Mahamaya. She was also very kind and loved by everyone. The righteous and mighty King Suddhodana ruled over the Sakya clan and kingdom. His capital was a very delightful place, where young girls walked graceful along the streets, wearing sparking jewelers. The city was decorated with large garden filled with beautiful flowers, peacocks and cool ponds.

> *"A unique being, an extraordinary Man arises in this world*
> *for the benefit of the many, for the happiness of the many,*
> *out of compassion for the world, for the good, benefit,*
> *and happiness of gods and men. Who is the unique being?*
> *It is the Buddha, the Exalted, Fully Enlightenment One".*
> *Anguttara Nikaya pt,1, P.22. x 111.*

On a full moon night, Queen Mahamaya had a strange dream. She dreamt of a huge white elephant come into the room, caring a white lotus flower in its tusk and walked round her bed three times. The next morning she told the King Suddhodana as to the dream, the King consulted the sages. The sages predicted, "You will give birth to a wonderful, great and noble child". Everyone in the kingdom celebrated when they heard that a baby was to be born to their Queen. The King and Queen were highly delighted as well.

When the baby was due, according to the custom at that time, the Queen asked to her husband if she could visit her parents in the neighboring kingdom. The King readily granted her wished and ordered that every ting possible should be done to make the journey pleasant.

Then the Queen was starting for her destination with a royal palanquin and was accompanied by many attendants all beautifully dressed and sparking with jewels. When the royal party came to Lumbini

pleasure Park, the Queen said "we shall stop and rest for a while under the cool shade". It was a most beautiful pleasers garden in about 6th – 7th century B.C. and was entertained by Sakya of Kapilavatthu and Koliyan of Devadaha. Now the modern Lumbini lies about 250 K.M. southwest of Katmandu, the capital of Nepal and 21 K.M. west of Bhairawa, set in an area of five square miles of lands capped garden and it is a feast to the eyes as well as the soul. It was about twenty-five centuries ago on the full moon day in the month of Baishakh or May, when the Queen Mahamaya arrived at this delightful place under a Sala tree, within sight of the snow-capped Himalayas, she had a baby boy. Then, all the trees were in flowers and a gentle breeze song to the music of birds and animals of the lovely forest garden and bees hummed cheerfully as they flew from blossom to blossom, gathering honey as well as it was as if all nature was happy over the birth of this Prince. A soft rain fell and the air was filled with heavenly music. Showers of perfumed petals rained down. The deer and other animals in the park, sensing something special, came and looked in wonder at the illustrious baby Prince. Everyone was delighted at the birth. After having birth, the Baby Prince spoke a verse "I am the highest in the world. I am the foremost in the world. This is my last birth". Then he smiled and took seven steps and sprang open lotuses under his feet in every stapes. The baby Prince was very beautiful. His skin was the color of gold and eyes were a lovely deep, violet blue. His hair was black and his whole body and limbs were perfectly formed. Afterwards, the party returned to the royal palace. As soon as the king Suddhodana saw his son and said, "I am filled with great joy. Let everyone in world rejoice". But within seven days after his birth, the Queen Maya died.

The King first recognized the extraordinary qualities of their child when the sage Ashita, who was wise and renowned for his wisdom as well as was a teacher to the King Suddhodana to came to visit the baby. On seeing the Prince, he first smiled and then tears begun to trickle down his face. The king and Queen worried and troubled. Then, they asked to wise

man, "Will some misfortune behalf the Prince?" "Oh, no, yours majesties", the sage replied. "Your son will be extremely fortunate. I am smiling because I am very lucky to see him, who is no ordinary human being. He is born to bring happiness to the world. He will be most unusual and a great leader among men. In fact, one day he will become a Buddha, a fully Enlightened One, who will teach the whole world how to find true happiness and relief from all sorrows. And I shed tears of sadness because, I shall soon die and not be able to honors him or learn from him as well as shall not live to see that day". Then the holy man said no more and went back to his cave in the snow-capped mountains. The King and Queen were not altogether happy at what they heard. He invited more learned and wise men the palace. They studied special markings on the body of the mighty Prince. Seven of them said also that, "He would one day become a great Emperor, or, indeed, a Buddha". The term "Buddha" means an Enlightened One. It is an honorary title applied to on who has reached the very peak of transcendental wisdom through the practice of the Ten great spiritual perfection in numberless births during an incomprehensible length of time. But the eighth sage was very definite that "the Prince would one day see four special Signs and give up his palace and family. He would lead the simple life of an ascetic in meditation and become a Buddha". The King and the Queen were very upset for these. The baby was given the named Siddhartha, which mean "a wish fulfilled" and his family name was Goutama.

The Quest for Enlightenment:

The second greatest event of the Buddha Prnima is his Enlightenment.

At the early age of sixteen, Prince Siddhattha married a beautiful young Princess called Yosodhara. She loved and cared for him. The King built for him three large and beautiful palaces, one for each of the three seasons of ancient India and he and his Princess lived happily in all these luxury. He continued to live with this princely life for nearly thirteen years

after his marriage. One day, the Prince wished to discover the world outside his palace. As soon as, the King knew about this, He gave an order to the people in the city, "Have the houses along the road to the city cleaned and decorated. Make certain that all the beggars, the old and the sick stay indoors until the Prince has left". The Prince went out with his faithful charioteer, Chanda. During his trip to the city, he saw four things, those were an old man. a sick person, a dead body and a monk, who was a man wearing a yellow robe and saved head. Only the monk gave him any comfort. He realized that even luxurious life could not bring him real happiness, and that he could not be really happy while other people were suffering. Then he wanted to find out the real happiness, that all people could share.

When the Prince was twenty-nine years old, on a quite mid night, he left his palace, his wife and lovely son Rahula, and his wealth to search peace, happiness, harmony, truth and emancipation, when in other world too many philosophers like Socrates and Plato in Grace, Zoroaster in Persia, Confucius in China, the Brahmanic and Jaina philosophers in India were also wandering for forth in search of peace and emancipation from the bonding. The Prince Goutama became poor wanderer, begging for his food and cutoff his hear as well as took all his princely cloth and jewelry down and having no home. He slept in forests and caves as well as constantly was looking for holy teacher who could tell him why there is always sorrow in life. He went to many well known teachers of that time and studied very hard, but no body satisfied him. Finally he found that all those teachers did not know how to find the truth out and that extreme self-denial was unless. He then left those teachers and wandered once again. Soon after, the acetic Goutama became so weak that one day he collapsed with hunger and pain. Then he realized that he cannot find out the way of truth living a life of luxury or with my body of so weak. Thus, he decided to follow a course between two extremes- that is "The Middle Path".

One day, the Siddhartha was sitting under a huge tree with severe weakness, a young village girl, name is Sujata, who lived in neighboring village, saw him and brought him a bowl of kheer. She said, "Venerable Sir, whoever you may be, god or human, accept this milk-rice. It will give you strength and may you attain that goal which you are seeking". The acetic Goutama smiled and said, "if you had not given me food, I would have died without finding the true way of happiness". Then he bathed in the river of the Noiranjana and sat on its bank and ate the milk-rice. After taking the food, he immediately felt stronger and returned to the river and placed the empty bowl on the water and said, "May this bowl float upstream if I am to attain Enlightenment". The bowl really did float upstream. He then returned to the shade of a banyan tree at Bodh Gaya (near Gaya in modern Bihar, India) and with complete faith in himself, started to meditate. Silently he vowed, "even if my flesh and blood were to dry up, leaving only skin and bone, I will not leave this place until I find a way to end of all sorrows". He was determined to discover the source of all pain and suffering in the world. With determined will, he continued to meditate until his mind become pure and clear. But, how long he meditate under the banyan tree is not truly known, some commentaries say seven days, some say as many as forty-nine days.

During a full-moon night in Baishakh, when the full moon shone, casting a bright silver light on the whole countryside, at the age of 35 of the acetic Goutama, unaided and unguided by any supernatural agency, and soley relying on his efforts and wisdom, eradicated all defilements, ended the process of grasping and realizing things as they truly are by his own intuitive knowledge he reached at the real happiness, realized the truth, gained Ultimate peace, attained supreme Enlightenment and knew the cause and cure of all human sorrows. He also discovered "the Four Noble Truths", they are- the Truth of suffering (Dukkha), the Truth of the cause of suffering, the Truth of the end of suffering and the Truth of the path leading to the suffering, and the "Dependent Origination"

(Paticcasamuppada). Above all, he became a Buddha. The banyan tree has ever since been known as "the Bodhi tree"- the tree of Enlightenment where the Buddha meditated. After the enlightenment, since then, the prince Siddhattha was known as the Enlightenment One, Perfect One, Awakened One, Blessed One and the Buddha which means "He who knows everything".

The Passing Away (Parinirvana)-

The third greatest event in the Master's life commemorated on the occasion of Buddha Purnima is his Mahaparinirvana or passing away. The story of the Buddha's last days is told in vivid and moving details in the Mahaparinirvana Sutta.

The Buddha had wandered over all of India, taught the truth and preaching the doctrine of real happiness to the people for forty-five years. His every action had been for the shake of others. He was really happy to preach to all. At the age of eighty, the Buddha felt that his end was coming closer and the age of him was almost dying and moving to Kushinara. A meal offered to the Buddha by Chunda, a blacksmith. He became ill after the meal near Kushinara, in modern Uttar Pradesh, but He insisted on continuing as fas as Kushinsra. Ananda, his faithful attendant, wept to see the Lord Buddha so ill. The Buddha comforted him saying, "Do not grieve, Ananda, I am old and feeble and cannot live forever. It is natural for everything that is born to die. I shall pass into the final nirvana, a state of ultimate peace and happiness. Call all the monks and nuns together".When they reached at under a Sala grove in Kushinara, the Buddha humbly said to Ananda, "I can go no further, prepare resting place for me between these two large Sala trees". All disciples, who were present there, weft and begged their teacher to remain alive for welfare to all in the world. Anada asked with tears in eyes, "When the Buddha is no longer in the world, who there to teach us?" The Buddha replied, "What more is there to teach, Ananda? I have taught you

all I know. There is nothing that I have kept hidden. My teachings are your teacher now. Follow them and you will be true to me." On the the full-moon day of Baishakh, the Buddha lied down on his right side with his head to the north. Hearing that, the Buddha was dying, people came from afar to pay their last respect. At dusk when the grove was cast in purple shadows, the Buddha entered into final Nirvana. He continued to teach until his last moment. Before departing, he spoke his last speech, "Everything is subject to change. Remember to practice the teachings earnestly".

All his disciples, followers and villagers gathered around him and wept. According to custom, the Buddha was cremated with all pomp and ceremony due to royalty. Shining, jewel-like relies were found in the ashes and it found their way to many Buddhist countries to be treasured and revered for all time. He left as with his most valuable and enduring teachings and the way to find real happiness.

The Buddha's sublime personality has given birth to a whole civilization guided by lofty ethical and humanitarian ideals, to a vibrant spiritual tradition that has ennobled the lives of millions with a vision of man's highest potential. His graceful figure in the centerpiece of magnificent achievements in all arts- in literature, painting, sculpture and architecture. The Buddha's gentle, inscrutable smile has blossomed into vast libraries of scriptures and treatises attempting to fathom his profound wisdom. Today, as the Buddhism becomes better known all over the globe, it is attracting an ever-expanding circle of followers and has already started to make an impact on Western culture. Hence it is most fitting that the United Nation should reserve one day each year to pay tribute to this man of mighty intellect and boundless heart, whom millions of people in many countries look upon as their master and guide.

The Buddha passed away about two and half thousand years ago. Since then, his teachings of compassion, peace, love and wisdom have been

passed on from hearts to hearts, from generation to generation, from country to country, right down to the present day.

"MAY ALL CREATIONS BE HAPPY IN THE UNIVERSE"

Reference:

1. *The Story of the Buddha, Published by- The Association of Buddhist Women in the UK.*
2. *Buddhism Key Stage 11, Published by- Buddhist Education Foundation (UK).*
3. *The Buddha and His Teaching. By- K. Sri Dhammananda.*
   The Buddha & His Message. By- Bodhi Bhikkhu.

☞ যে কর্ম করে পরে অনুতাপ (অনুশোচনা) করতে হয়, অশ্রুমুখে কেঁদে কেঁদে যে কর্মের ফল ভোগ করতে হয়, সেরূপ কর্ম না করাই ভাল।

☞ যে কর্ম করে অনুতাপ করতে হয় না, যে কর্মের ফল সানন্দেও প্রসন্ন মনে ভোগ করা যায়, সেরূপ কর্ম করাই ভাল।

বালবর্গ, ধর্মপদ।

☞ যদি কেহ কখনো পাপকর্ম করে থাকে সে যেন বার বার তা না করে এবং তাতে রুচি না জন্মায়, কারণ পাপের ফল দুঃখজনক।

☞ কল্যাণ (পুণ্য) কর্ম অতি সত্বর (তাড়াতাড়ি) কর, পাপ থেকে চিত্তকে (নিজেকে) বিরত রাখ, কারণ বিলম্বে পুণ্যকর্মকারীর মন পাপেতে রমিত হয়।

পাপবর্গ, ধর্মপদ।

কথায় নয়, কাজে বিশ্বাসী হই

শ্রীমৎ জ্ঞানদর্শী ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

সিদ্ধার্থের জন্ম, বোধিলাভ ও মহাপরিনির্বাণের স্মৃতিতে ভাস্বর আজকের বৈশাখী পূর্ণিমা। এ ত্রি-স্মৃতির অনুভবে শ্রদ্ধেয় আদিকল্যাণ ও শরণংকর ভান্তেদ্বয়ের উৎসাহে লোভ সংবরণ করতে না পেরে ভাষাহীন লেখনী **'কথায় নয়, কাজে বিশ্বাসী হই'** এ পংক্তিটি সামনে রেখে কিছু লিখতে চেষ্টা করলাম।

ইতিহাসের পাতা খুললে দেখা যায়, জগতের বহু মনীষী মানবের দুঃখমুক্তির জন্য চিন্তা করে এক-একটি ধর্মের আবিষ্কার ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মের প্রচার করেছিলেন। বহু ধর্ম এভাবে পৃথিবীর বুকে জন্ম নিয়েছিল আবার পৃথিবীর বুক থেকে বিলীন হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ও খিস্টান ধর্ম। পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে প্রায় সব ধর্মের উৎপত্তির মূলে নানা নামে সৃষ্টিকর্তা বিদ্যমান। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির উৎস, প্রজ্ঞা ও বীর্যই এর জীবন এবং জীবের বিশেষতঃ মানবের দুঃখ নিবৃত্তিতেই এর চরিতার্থতা। এটাই বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য। বৌদ্ধধর্মকে পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিকভাবে বাস্তব এবং বস্তুগত বলে স্বীকার নেয়া হয়েছে। একমাত্র বৌদ্ধধর্মেই সৃষ্টিকর্তা বা পরনির্ভরশীলতার উপর তেমন গুরুত্ব না দিয়ে নিজেকে নিজের প্রভু বা মুক্তিদাতা বলা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে অলৌকিকতা, কাল্পনিকতা এমনকি দেব-দেবীকেও নিজের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়নি। সত্য যার কাছে রয়েছে দেবতাও তার নিকট মাথানত করতে বাধ্য হয় বলে বৌদ্ধধর্ম স্বীকার করে।

শুনেছ বলে সব কথা বিশ্বাস করো না।

কিংবদন্তি শাস্ত্রবাক্য এবং ঐতিহ্যবাহী বংশ পরম্পরা গৌরবে মুগ্ধ হবে না।

বহু লোকে বলেছে এবং বহুলোকের দ্বারা প্রচারিত হয়েছে বলে তা গ্রহণ করো না।

ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে বলে সবকিছুকে বিশ্বাস করো না।

বয়োজ্যেষ্ঠের এবং গুরুজনের সব কথা বিশ্বাস করোনা।

তবে সূক্ষ্ম এবং নিখুঁত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যদি সঠিকভাবে জান যে এটা খাঁটি, এটা নিজের জন্য এবং সকলের জন্য মহামঙ্গলজনক তবেই তা বিশ্বাস করো এবং আজীবন কাজে লাগাও।

শাক্যজাতির চরম সৌভাগ্য যে শাক্যজাতিতে ভগবান বুদ্ধের জন্ম। আর চাকমা জাতিরও পরম সৌভাগ্য পুণ্যপুরুষ আর্যশ্রাবক বনভান্তের জন্ম। চাকমারা শাক্যজাতি পূজনীয় বনভান্তেও বলেছিলেন। আর ১৯৮৩ সনে ২ মার্চ নেপালের লুম্বিনী উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পন্ডিত লোকদর্শন ব্রহ্মচরিয়া বললেন– "হে চাকমাগণ, আপনাদের চেহারা আচার–আচরণ, সংস্কৃতি সবকিছুই আমাদের নেপালের কপিলাবস্তু নগরীর শাক্যবংশীয়গণেরই ন্যায়। আপনারা কেউ চাচা, কেউ বা চাচী। আপনারা আর আমরা একই রক্তধারার লোক বা আত্মীয়–স্বজন। কালের আবর্তে আমরা একে অন্য হতে পৃথক হয়ে গেছি। ঢাকা শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহারে শাক্যসিংহের ভূমিস্পর্শ অভয় মুদ্রায় মূর্তিটি দান করার সময় তিনি আবারও ঘোষণা দিলেন– "আজ আমার এখানে আগমন সার্থক যে, শাক্যমুণির মূর্তি, শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহারে, শাক্যজাতি হতে শাক্যজাতির নিকট দিতে পারলাম। উপরের সব কথার শেষ কথা হচ্ছে আমরা শাক্যজাতি। শাক্যজাতি হিসাবে আমরা কতটুকু আমাদের বৌদ্ধধর্ম পালন করছি; আর দান, শীল ও ভাবনাই বা কতটুকু অনুশীলন করছি– তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু পরিচয়ে শাক্যজাতি হলে হবে না– কাজেই পরিচয় হতে হবে। অতীতে শাক্যজাতির ধ্বংসের ইতিহাস ভুলে গেলে চলবে না, বর্তমান সময়েও চাকমা জাতির দূরাবস্থার জন্য কারা দায়ী, ইতিহাস তাদেরও ক্ষমা করবে না। কি দারুণ অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন অতিক্রান্ত। কিছু বিবেকহীন লোকের কর্মকান্ডে আমাদের সামাজিক পরিবেশ ভারাক্রান্ত। দু'চোখ প্রসারিত করলেই করুণ আর বিমর্ষরূপ দৃষ্ট হয়।

আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর সুযোগ সন্ধানী মানুষ ও ভিক্ষু একত্রিত হয়ে সাধারণ মনের মানুষকে বিভিন্ন দোহায় দিয়ে সামাজিক ও ধর্মীয় শৃঙ্খলা বিনষ্ট এবং মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস করছে। তারা নিরীহ মানুষের ন্যায়বোধ কিংবা সুচিন্তিত কার্য সম্পাদনে প্রতিবন্ধক, অকারণে সামাজিক ও ধর্মীয় গতিকে ব্যাহত করছে। ফলে একদিকে অন্যায় অবিচারের মাঝে সামাজিক ও ধর্মীয় স্থিতিশীলতা যেমন বিপন্ন অন্যদিকে বিঘ্নিত হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা ও মানবতা। ইদানীং আমাদের সমাজে গুটিকয়েক ভিক্ষু নিজেদের যশ–কীর্তি, ক্ষমতা–খ্যাতির বশবর্তী হয়ে বিনয় বহির্ভূত কথা–বার্তা, আচার–আচরণ ও প্রতিপালন করে অধর্মবাদী কাজ করছে যা বুদ্ধশাসনের পরিপন্থী। তারা যদিও অনেক ভক্ত, বিশ্বাসী পরিবেষ্টিত থাকে অপরদিকে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা বিনষ্ট করছে–অশ্রদ্ধাবানদের আরও অশ্রদ্ধা সৃষ্টি করছে। এভাবে প্রতিনিয়ত শাসনের অহিত কর্ম সম্পাদন করে নিজেদের ক্ষতি করছে– করছে বুদ্ধ শাসনের। চরিত্রহীন সামাজিক কুলাঙ্গারের প্রভাব থেকে আর

মুখোশধারী ধর্ম অনিষ্টকারীদের বলয় থেকে রক্ষার জন্য সমাজের শিক্ষিত ও বিবেকবান ব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে হবে।

আসুন আমরা কথায় নয়, কাজে বিশ্বাসী হই। অন্যায় দিয়ে যেমন অন্যায়কে দূর করা যায় না; ঘৃণা দিয়ে ঘৃণাকে দূর করা যায় না। যায় না হিংসা দিয়ে হিংসাকে দূর করা। নীরব চিৎকারের মাধ্যমে আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এ সত্য বাক্যটি সামনে রেখে পঞ্চশীলে (নীতিতে) জীবন গড়ে তুলি–

আসল কথা হচ্ছে, পঞ্চনীতি বা পঞ্চশীল মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধের প্রবর্তিত চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধেরই অন্তর্গত। (১) প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকা; একথার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়– একটি শিশু যখন ক্রমশ বাড়তে থাকে মেধা ও মননশীলতার বিকাশ ঘটার শুরুতে প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করে এবং একটি প্রাণনাশের জন্য পরবর্তী জীবনে যে ভয়াবহ শাস্তি তার জন্য অপেক্ষা করে আছে তার যথার্থ মর্মার্থ শিক্ষা দেয়া হলে সেই শিশুর দ্বারা খুন, এসিড নিক্ষেপসহ কোন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ কখনো সম্ভব হবে না। ভালো সন্তান যেমন সকল বাবা–মার কাম্য, সমাজের, রাষ্ট্রের শান্তিও সবার কাম্য। অতএব প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ প্রতিপালন বাঞ্চনীয়।

অদত্ত দ্রব্য, সম্পদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করা। অনুরূপ আমাদের এই দেশটায় যে সমাজ ব্যবস্থার চালু রয়েছে তাতে করে কতো প্রকার যে হঠকারিতা, চুরি, ডাকাতি, দূর্নীতির আশ্রয় নিয়ে একে অপরের ধন–সম্পদ লুণ্ঠন করে সম্পদের পাহাড় গড়ার দুর্বার প্রতিযোগিতায় মত্ত সবাই। অপর দিকে শিশুটির মেধা ও মননশীলতা বিকাশের সাথে সাথে যদি পরের ধন হরণ, জবরদখল, উৎকোচ গ্রহণসহ অদত্ত যে কোন সম্পদ গ্রহণে বিরত থাকার শিক্ষাপদ দেয়া হয় এবং এরূপ হীন কর্মের অপরাধে পরবর্তী জীবনে অসহনীয় যন্ত্রণার অপেক্ষমান, এর যথার্থ মর্মার্থ যদি শিক্ষা দেয়া হয়; সজ্ঞাত কারণেই সে শিশু তার পরিপূর্ণ বয়সে সমাজের, রাষ্ট্রের, ব্যক্তি বিশেষের কোন প্রকার অনিষ্ট করবে না। অতএব, অদত্ত সম্পদ গ্রহণে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ অপরিহার্য।

মিথ্যা কামাচার বা ব্যাভিচার থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করা। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শের আকর্ষণে সত্ত্বগণের কাম উত্তেজনার উদ্রেক হয়। দেশের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেভাবে প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে বলাৎকার, ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তি; দেশে বাবা–মা'রা রীতিমতো উদ্বিগ্ন। সংবাদপত্রের পাতা খুললেই দেখা যায়– বর্বোরোচিত শিশু ধর্ষণ থেকে শুরু করে ৩–৪ ছেলের মা পর্যন্ত ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। আর এই ধর্ষণের শিকার দেশের অসহায় নারী সমাজ। অথচ এই নারীরাই আমাদের মা–বোন, মেয়ে। কাম উন্মত্ততায় ভীত গোটা নারী সমাজ।

সন্ত্রস্ত অভিভাবক। যদি একটি শিশুকে তার মেধা ও মননশীলতার পরিবর্ধনের পাশাপাশি মিথ্যা কামাচার তথা ব্যাভিচার থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ দেয়া হয় এবং মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকার কারণে পরবর্তী জীবনে যে বিভীষিকাময় যন্ত্রণাদায়ক এবং অপরিমেয় দুঃখ অপেক্ষা করে আছে। তার বিশদ বিবরণ যদি তাকে বিশ্লেষণ করা হয় সেই শিশু যুবা বয়সে মুহূর্তের জন্যেও নারী রসের প্রতি আকর্ষিত হতো না। মোহমুক্ত চিত্তের বৈশিষ্ট্যতায় ভরে যেতো আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র। আতংকিতভাবে জীবন-যাপন করতো না আমাদের বাবা মা-রা। উৎকণ্ঠায় ভীত সন্ত্রস্ত হতো না নারী সমাজ। হারাতো না তার অমূল্য নারীত্ব। অতএব, বুদ্ধের পঞ্চনীতির একটি মিথ্যা কামাচার থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করা গোটা বিশ্বের বিশাল জনপদের জন্য মঙ্গলবার্তা নয় কি?

মিথ্যা বলা, পর সমালোচনা থেকে বিরত থাকা কিংবা মিথ্যার আশ্রয়ে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ। বিশেষ করে আমাদের সমাজে রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেভাবে মিথ্যা প্রতারণা প্রহসনের ছবি সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আজ গুঁটি কয়েক মানুষের কাছে জিম্মি। মানব সভ্যতা ক্রমবিকাশে জ্ঞান পরিধি স্বচ্ছ এই জনগোষ্ঠী হিংসা-বিদ্বেষ আর মোহে অন্ধ হয়ে মিথ্যাকে আশ্রয় করে একজন অপরজনকে ঠকাচ্ছি। শ্রেণী বৈষম্যতায় একজন অপরজনের নিন্দায় মেতে আছি। যদি একটি শিশুকে তার মেধা মননশীলতার বিকাশ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তার বাল্যশিক্ষার পাশাপাশি মিথ্যার আশ্রয়, পর সমালোচনা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ প্রদান করা হয় এবং মিথ্যাচারের জন্য পরবর্তী জীবনে তাকে অসহনীয় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে আর এই গর্হিত কর্মের জন্য অপেক্ষা করা দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে বদ্ধমূল ধারণা দেওয়া হয়, তাহলে সেই শিশুটি তার পরিপূর্ণ বয়সে মিথ্যার আশ্রয়ে থেকে রাষ্ট্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস পেত না।

সুরাপান থেকে বিরত থাকা, সকল প্রকার মাদকাসক্ত থেকে বিরত থাকা। বলা বাহুল্য যে, বর্তমান আধুনিক বিশ্বে পারিবারিক অনুষ্ঠান কিংবা সামাজিক অনুষ্ঠান সমূহে মদ্যপান একটা ফ্যাশন হিসেবে দাঁড় করা হয়েছে। এ ছাড়াও আজকের অসুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় উচ্ছন্নে গেছে যুব সমাজ। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, আজকের যে সমস্ত যুবক হেরোইন, কোকেন, গাঁজা, ফেনসিডিল, ইয়াবা-এর মতো বিষতুল্য ড্রাগ সেবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এ কারণে বলার যথেষ্ট অবকাশ থাকে যে, এমন গর্হিত কাজের জন্য আমাদের অভিভাবকদের অসচেতনতা। শুধু তাই নয়, মাদকাসক্ত যুবকদের অস্বাভাবিক জীবন-যাপনের ফলশ্রুতিই আজকের এই সামাজিক অবক্ষয়, অশান্তি, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি। এরই সাথে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আজকের প্রজন্ম। হয়তো এমনি ধারাবাহিকতায় সমাজ, রাষ্ট্রের অবকাঠামো ভেঙ্গে

পড়বে একদিন; নেতৃত্বহীন হবে দেশ। তদনুরূপভাবে একটি শিশুর ক্রমবর্ধমানে তার মেধা ও মননশীলতা বিকাশের পাশাপাশি সুরাপান তথা সকল প্রকার মাদকাসক্ত থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা সহকারে প্রদান করা হয় এবং জন্ম-জন্মান্তরের জন্য বিভীষিকাময় দুঃখ-যন্ত্রণা অপেক্ষমান। তাহলে কখনো সে এরূপ মাদকাসক্ত হবে না।

অতএব, তথাগত বুদ্ধের পঞ্চনীতি সমাজ গঠনের, রাষ্ট্রের অবকাঠামো নির্মাণে অপরিহার্য হয়ে পড়ছে বৈকি। বিশ্বের প্রতিটি অভিভাবক যদি বুদ্ধের এসব সুনীতির অনুসারী হয় এবং শীলের আদর্শে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করেন- তা'হলে আগামী বিশ্ব কলুষমুক্ত, শান্ত, সৌম্য, সুন্দর ও সার্থক হবে। আসুন আমরা সবাই কথায় নয়, কাজে বিশ্বাসী হই।

☞ পাপকারী (পাপী লোক) ইহলোক-পরলোক উভয়লোকে অনুশোচনা করে, স্বীয় মন্দ (পাপ) কর্ম দেখে অনুতপ্ত ও মর্মাহত হয়।

☞ কৃত পুণ্য (পুণ্যবান) ব্যক্তি ইহলোক-পরলোক উভয়লোকেই আনন্দিত (সুখী) হন। আমার দ্বারা পুণ্য করা হয়েছে, তা স্মরণ করে তিনি আনন্দিত হন এবং সুগতি প্রাপ্ত হয়ে তিনি পরমানন্দ লাভ করেন।

যমক বর্গ, ধর্মপদ।

বনভন্তে, মম হৃদয়মন্দিরে তুমি চির অধিষ্ঠিত

শ্রীমৎ শোভিত ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি

[আজ থেকে অনেক বছর পূর্বে ঘটে যাওয়া এক সত্যি ঘটনা। ময়মনসিংহের মেয়ে সুস্মিতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে সেলিম নামে এল ছেলের প্রেমে পড়ে। দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ভেঙে গেলে জীবনের মানে আর খুঁজে না পাওয়ায় সুস্মিতা, চাকমা বান্ধবী শিখার মাধ্যমে ঘটনাক্রমে পরম পূজ্য অর্হৎ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)–এর সাথে সাক্ষাতে জীবনের চলার পথ আবারও নতুনরূপে খুঁজে পায়। সেই সত্যি ও বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে রচিত হয়েছে এ গল্পটি। লেখাটিতে বনভন্তে ব্যতীত সব চরিত্রে ছদ্ম নাম বা রূপক নাম ব্যবহৃত হয়েছে। বলাবাহুল্য, গল্পের প্রয়োজনে লেখাটিতে কিছু বিষয় সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়েছে।]

(এক)

পূর্ণচন্দ্রিমার উজ্জ্বল প্রভায় রাতের আঁধার ভেদ করে আজ চৌদিক ফর্সা হয়ে উঠেছে। বড্ড মিষ্টি–মধুর লাগে এমন আলো–আঁধারি পরিবেশ। এমন রাত কার না ভাল লাগে! ইচ্ছে করে, হাঁটি হাঁটি পা পা করে চপল পায়ে একাকী কোথাও হারিয়ে যেতে। আরো ইচ্ছে করে, এ জগত সংসারের সব কিছু পেছনে ফেলে, সব কিছু ভুলে গিয়ে শুধু নিজেকে নিয়েই একান্তভাবে কল্পনার সাগরে ভেসে যেতে। মনে হয় প্রকৃতিও যেন আলো–আঁধারিতে চুপি চুপি এসে বলে, 'এসো সখী, সংসার সাগরে আর পড়ে থেকো না। চল, হারিয়ে যাই সুদূরে'। মন ভাল করা এমন পূর্ণিমার চন্দ্রালোকের রাতে বোধ হয় জগতে শুধু একজনেরই মন ভাল নেই। ক'মাস আগেও ঐসব ইচ্ছে–ভাবনা–অনুভূতিগুলো সুস্মিতার হৃদয় আকাশে পাখা মেলে বেড়াত। আর হৃদয়ের অলি–গলিতে ঘুরে বেড়াত শুধু একটি নাম, সেলিম। হ্যাঁ, জীবনের স্বপ্নগুলো ছিল সব সেলিমকে ঘিরে। এক আশ্চর্য মায়া কাজ করত প্রাণের চেয়ে প্রিয় সেলিমের জন্য। আর আজ? সময়ের স্রোতে সুস্মিতার হৃদয় ভেদ করে আজকাল ক্রমাগত যেন কষ্টের তীরগুলো ছুটে যায়। নিঃসীম মনোকষ্টে সারাক্ষণই শুধু ভাবতে থাকে–'হায়! সেলিম, তুমি কেন এমন করলে! কি দোষ করেছিলাম আমি? না মন–প্রাণ উজাড় করে তোমায় ভালবেসেছিলাম, তা–ই কি আমার দোষ ছিল? না মন–প্রাণ উজাড় করে তোমায় ভালবেসেছিলাম, তা–ই আমার দোষ ছিল? সেলিম, তোমার সাথে তো আমি কোন ফাঁকিবাজী করিনি!' এসব ভাবলেই সুস্মিতার বুকের গভীর থেকে দীর্ঘশ্বাসের ব্যারোমিটার

শুধু উর্ধ্বেই উঠতে থাকে। কিন্তু না ভেবেও পারে না। হৃদয়ের মাঝে সেলিমের স্মৃতি যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাই শুধু চুপি চুপি নিঃশব্দে কাঁদা ছাড়া আর কোন উপায় সুস্মিতা খুঁজে পায় না। কেঁদে কেঁদে চোখ-মুখ ফুলে ফেঁপে উঠে। চোখের জলের নোনতা স্বাদে জীবনের আর সবকিছুর স্বাদ হারিয়ে যায়।

যেদিন সেলিম তাকে ফোনে বলেছিল, "সুস্মিতা, সম্পর্ক কখন শেষ হয়ে যায়, জান? যখন ভালবাসা ফুরিয়ে যায় কিংবা সেই ভালবাসায় আর মন মজে না। জানি না, তুমি কি ভাবছ? শোন, তোমার সাথে আমার সম্পর্ক এখানেই শেষ। আমার আর কোন খবর রেখো না। মনে করো, তোমার কাছে স্বপ্নে এসেছিলাম, স্বপ্নেই চলে গেছি। ভাল থেকো, সুস্মিতা।" সেদিন থেকেই তার সুখের পৃথিবী ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। এরপর থেকে প্রতিটি দিন কাটে অনাদরে, অবহেলায়, আশাহীন, স্বপ্নহীনভাবে। প্রথম প্রথম মা তাকে সান্ত্বনা দিত, বুঝাত, বলত যে-"বাছা, এভাবে ভেঙে পড়ো না। জীবনে এমন ঘটনা ঘটে থাকে। জীবনটা কি এতই ঠুনকো যে এত সহজে তুমি ভেঙে পড়ছ? এভাবে থাকা মানে জীবনে পরাজিত হওয়া। জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে শেখো। আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখতে থাক, জীবনটাকে সাজিয়ে নাও।" কিন্তু কে শোনে কার কথা! এখন সেই সহানুভূতিশীল ও স্নেহময়ী মাও যেন শত্রু হয়ে গেছে।

পূর্ণিমার রাত এলেই সুস্মিতার মন আরো বেশী খারাপ হয়ে যায়। এমন পূর্ণিমার রাতেই তো তার সাথে ফোনে প্রথম কথা হয়েছিল। সেদিন কেন জানি সুস্মিতার দু'চোখে কোন ঘুম ছিল না। ঘুম কিভাবে যাওয়া যায়, তা নিয়েই মুশকিলে পড়েছিল। অতঃপর কাছে থাকা ফোনে অজানা নম্বরগুলো টিপতে টিপতে হঠাৎ সেই মধুর, স্মার্ট কণ্ঠের অধিকারী সেলিমের কাছাকাছি চলে আসা। অথচ আজ সুস্মিতার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে সব চাওয়া-পাওয়া। জীবনের স্বপ্নগুলো উড়ে গেছে কোন সুদূরে।

'আর কত সহ্য করা যায়? হৃদয় মন্দিরে কষ্টগুলো জমাট বাঁধতে বাঁধতে সব যে মরিচা ধরে গেছে। জীবনে এত কষ্ট কেন আসে? এক নাগাড়ে কথা বলে ফোন রেখে দিলে, আমাকে জানতেও দিলে না, আমার ভালবাসায় তোমার কেন এত অনীহা? শুধু এক বুক কষ্টই দিয়ে গেছ। এ-ই কি প্রাপ্য ছিল আমার? উফ! ভীষণ কষ্ট এ বুকে। কষ্টের রং কেমন? লোকে যে বলে নীল, তেমন কি? জানি না, কিছুই জানি না, জানতেও চাই না। হে খোদা, তুমি মোর সহায় হও। আর যে পারছি না।' এসব ভাবতে ভাবতেই নিজেকে এ জগত সংসারে প্রচন্ড একা, অসহায় মনে করা সুস্মিতা হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নেয়, "নাহ, আর আমি কষ্ট সহ্য করব না। জীবনের স্বপ্নগুলো যেমন হারিয়ে গেছে জীবন থেকে, তেমনি

কষ্টগুলোকেও আজ আমি মুছে দেব জীবন থেকে। হ্যাঁ, আজই সেই উপযুক্ত সময়। আজকের মত এমন পূর্ণ চন্দ্রিমা ভরা রাতেই তো তার সাথে প্রথম কথা হয়েছিল। আমার সাথে সে যখন নিষ্ঠুর প্রতারণা করল তখন এ জীবন আর রাখা কেন? এ জীবন আর রাখব না। এ পূর্ণিমার রাতেই আজ জীবনের সব লেনদেন চুকিয়ে দেব। না সেলিম, আমার মৃত্যুর জন্য তোমাকে দায়ী করব না। যদি তা করি তবে তো আমার ভালবাসার সাথে বেঈমানি করা হবে। তুমি কোন চিন্তা করো না, কেমন?

(দুই)

জানালার ফাঁক গলে আসা পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া রুমের মাঝে সুস্মিতা সিলিং ফ্যানের প্রায় সোজা করে পড়ার টেবিলটা নিঃশব্দে টেনে আনার চেষ্টা করে। এত সাবধানে টেনে আনার চেষ্টা করেও অবুঝ টেবিলটার পাগুলো মেঝের সাথে ঘর্ষণে কেমন করে যেন ভয়ঙ্করভাবে 'ক্যাচ ক্যাচ' শব্দ করে উঠে। এমন শব্দে নিজেই চমকে উঠে ভাবে, নিঃশব্দ রাত কি তবে বেশী কান্না করে! দ্যাৎ, যতসব আবোল-তাবোল ভাবনা। অবশেষে ফ্যানের সাথে ওড়নাটা শক্ত করে বেধে গলায় পেঁচায়। শরীরটা শূন্যে ভাসিয়ে দিতে যাবে এমন মুহূর্তে দরজায় দড়াম দড়াম আওয়াজ হতে থাকে। মা চিৎকার করে ডাকছে। কোন সাড়া না পেয়ে চিৎকার, চেচামেচি আরো বেড়েই চলছে। সাথে বাপ, ভাই-বোনদের হাঁকডাক। না, সুস্মিতা আজ আর কোন কিছুতেই কান দিতে চায় না। নিবিষ্ট মনে গভীর অরণ্যে ধ্যানী পুরুষের ন্যায় তার মনে শুধু একটাই ভাবনা 'মৃত্যুর দেশে চলে গিয়ে সব দুঃখগুলো সে মুছে ফেলবে'। এমন সময় মা আর্তনাদ করে বলে উঠে, "মা সুস্মিতা, বাছা আমার, দরজা খোল, আমার কসম লাগে। আমি তোকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করেছিলাম, তার কসম লাগে, দরজা খোল। মা'রে, দরজা খোল।" এ কথা শুনতেই সুস্মিতার বুকটা কেমন যেন ছ্যাত্ করে উঠে। হৃদয়ে কিসের যেন এক আন্দোলন হয়ে যায়। মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, না, সে আত্মহত্যা করবে না। মা-বাবা-ভাই-বোনদের জন্য হলেও সে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে'।

অতঃপর দরজা খুলে দিয়ে বুকের মত ঠাই দাড়িয়ে থাকে। সবকিছু দেখে পরম মমতার আধার মা-বাবা তাকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে থাকে। বাবা চোখের জলে একাকার হয়ে বলে উঠে, "সুস্মিতা, তুই কেন আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলি? আমার জন্য তোর পরান কি একটুও কাঁদে না?" সুস্মিতা বলে বাবা, আমি ভুল করতে যাচ্ছিলাম---- আমাকে তোমরা ক্ষমা করে দাও। আর কখনও এমন ভুল হবে না।" এদিকে মায়ের মুখে কোন রা নেই। হঠাৎ কি হয়ে যায় কে জানে, হু হু করে কেঁদে উঠে মা বলতে থাকে,

"তোকে তো আগেই বলেছিলাম, জীবনে অনেক বাধা–বিপত্তি আসে। তাই বলে তাতে হার মানবি কেন? আত্মহত্যা করলেই কি সব কিছুর সমাধান হয়ে যায়? আত্মহত্যা করা মানে তো পরাজয় বরণ করা। কেন তুই পরাজিত হবি?" গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা আবারও বলে, "তুই কেন সেই ছেলেটাকে ভালবাসতে গিয়েছিলি? তোকে কত আশা করে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলাম। পড়ালেখা শিখে অনেক বড় হবি। পরিবার, সমাজ, দেশের জন্য কিছু অবদান রাখবি। আর তুই তা না, এখন জীবনটাই বলি দিতে যাচ্ছিলি!" মা–বাবা আরো অনেক কিছুই বলে যায়। ছোঠ ছোট ভাই–বোনেরা শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এ মুহূর্তে সুস্মিতার সবার প্রতি যেমন ভীষণ মায়া লাগে তেমনি নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়। 'কেন আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলাম? তাই তো! আমাকে ঢাকায় পাঠিয়েছিল পড়ালেখা শিখে মানুষের মত মানুষ হওয়ার জন্য। আর আমি কি করতে যাচ্ছিলাম? হায়রে! ঢাকায় পড়ুয়া আরো অনেকের তো এমন দশা! আর ছেলেদের কথাই বা কি! কতজনে মদ, গাজা, হেরোইন, ফেনসিডিল খাচ্ছে, সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত আছে। আচ্ছা, তাদের মা–বাবা'রা এসব করার জন্য কি তাদের ঢাকায় পাঠিয়েছিল?' আর কিছুই ভাবতে পারে না সে, মাথাটা বড্ড টন্ টন্ করে উঠে। অবশেষে বিছানায় মায়ের বুকে মাথা রেখে ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যায়।

এর কিছুদিন পর মানসিকভাবে কিছুটা সাম্য হলে, সুস্মিতা ঢাকাতে চলে যায়। আবার ক্লাশে, লাইব্রেরীতে, বন্ধুদের আড্ডায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু কেন জানি সেই দুঃসহ স্মৃতি মাঝে মাঝেই মস্তিষ্কে হানা দেয়। তখন আবারও শরীরের প্রতিটি নিউরনে নিউরনে, অনু–পরমাণুতে কষ্টগুলো জেগে উঠে। মাঝে মাঝে এমন হয় যে নাওয়া–খাওয়ারও ঠিক থাকে না।

অতঃপর কোন একদিন অতি লজ্জায় সেসব গোপন কথা সুস্মিতা তার কাছের চাকমা বান্ধবী শিখাকে বলে ফেলে। সব শুনে শিখা বলে, "তুই ঐসব ব্যাপার নিয়ে আর চিন্তা করিস্ না তো। যা হবার তা তো হয়েছে। কি লাভ সেসব চিন্তা করে? যতই চিন্তা করবি ততই অক্টোপাসের মতো সেসব চিন্তা তোকে ঘিরে ধরবে। তোর মনে যে আগুন জ্বলছে, তাতে আর লাকড়ী দিস্ না, পানি দিয়ে নিভিয়ে ফেল।" সুস্মিতা অসহায়ের মতো বলে উঠে, "পানি কোথায় পাব, তা–ই তো জানি না। কিছুতেই নিভাতে পারছিনা মনে জ্বলতে থাকা কষ্টের আগুন।" "তোকে একটা বুদ্ধি দিতে পারি অথবা পরামর্শও বলতে পারিস। আমি হানড্রেড পারসেন্ট নিশ্চিত, তুই আমার কথা ধরলে তোর উপকার বিনা অপকার হবে না।" "বুঝেছি, তুই ডাক্তারের কথা বলবি তো"! "যার কথা বলতে চাচ্ছি, তাঁকে ডাক্তারও বলা যায়।";

"এম, এ ডিগ্রীধারী না; পি, এইচ, ডি ডিগ্রীধারী?" "শোন্, তিনি ঐসব কোন ডিগ্রীধারী না। কিন্তু তার চেয়েও কোটি শত-সহস্র গুণে তাঁর প্রজ্ঞা রয়েছে। তিনি একজন মহান সাধক। তাঁর অলৌকিক কীর্তিও সর্বজন বিদিত। বাংলাদেশের মধ্যে লোকোত্তর (সিদ্ধপুরুষ) দিক দিয়ে তিনি সর্বোচ্চ, প্রধান বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরু। অর্থাৎ তিনি একজন অর্হৎ। কোন অর্হৎ যদি কোন ব্যক্তি আশীর্বাদ (অরহতের নিকট সকলেই সমান, তবে নিজের মাধ্যমে অভিশাপ বা আশীর্বাদ হয়ে থাকে) কাউকে প্রদান করেন তাহলে তা অবশ্যই ফলপ্রসু হবে। সূর্য যেমন পূর্ব দিকে উঠে, পশ্চিম দিকে অস্ত যায়, তা যেমন চিরন্তন সত্য, তেমনি অর্হতের আশীর্বাদও ফলপ্রাপ্ত হবে, এটাও চিরন্তন সত্য। সেই মহান অর্হতের নাম হল বনভন্তে। দীর্ঘ অ-নে-ক বছর বনে-জঙ্গালে একাকী ধ্যান-সাধনা করেছিলেন বলে তিনি বনভন্তে নামে সুপরিচিত। রাঙ্গামাটির রাজবন বিহারে গেলে তাঁর দেখা পাবি।" এক নাগাড়ে অনেক কথা বলে শিখা থামে। সুস্মিতা অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহের সুরে বলে, "কিন্তু আমি তো মুসলিম, ইসলাম ধর্মাবলম্বী। আমার কি বৌদ্ধধর্মীয় গুরুর আশীর্বাদে কোন কাজ হবে?" "বোকা মেয়ের মতো তুই এসব কি বলছিস? সত্য চিরদিনই সত্য। সত্যের কি কোন ব্যাত্যয় ঘটে? প্যারাসিটামল খেয়ে সবারই জ্বর ভাল হয়। প্যারাসিটামল কি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান বাছাই করে রোগের উপশম ঘটায়? ঠিক তেমনিভাবে মনে করবি যে বনভন্তে সেই প্যারাসিটামল বড়িটার মতো সবার জীবনে সুখ-শান্তি আনয়ন করেন।"

সত্যি বলছিস্! সেই ধ্যানী পুরুষের আশীর্বাদ পেলে আমার সব কষ্ট দূর হবে! "অবশ্যই। তুই একবার গিয়ে দেখ না! তাঁকে দেখলে তোর মন এমনিতেই শান্ত হয়ে যাবে।" "ঠিক আছে, আমি যাব। আশীর্বাদ নেয়ার সাথে সাথে একটা তাবিজও নেব।" "আরে না, বৌদ্ধধর্মে তাবিজ-তুবিজের কোন স্থান নেই। তুই শুধু বনভন্তের উপদেশানুসারে কাজ করবি।" "ঠিক আছে, তিনি যা বলবেন তা-ই করব। কিন্তু একটা তাবিজ নিলে ক্ষুতি কি?"-----।

(তিন)

প্রতিদিনের মতো সেদিনও সকালের দিকে রাজবন বিহারের (পুরাতন) দেশনালয়ে পরম পূজ্য ষড়াভিজ্ঞা অর্হৎ কল্যাণমিত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) সমবেত দায়ক-দায়িকাদের উদ্দেশ্যে সদ্ধর্ম দেশনা করছিলেন। এরই মাঝে সুস্মিতা শিখাকে সঙ্গে নিয়ে বনভন্তের সকাশে উপস্থিত হয়ে অন্যান্য দায়িকাদের পাশে উপবেশন করল। চাকমা ভাষাতে ধর্মদেশনা দেয়ার কারণে অনেকক্ষণ যাবৎ শুনেও সুস্মিতা কিছুই বুঝতে সক্ষম হল না। এদিকে এতক্ষণে তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে বনভন্তের সাথে কথা বলার জন্য। তাই

তা সহ্য করতে না পেরে অতিশয় কাতর কণ্ঠে বলল, 'ভন্তে, আমি আপনার সমীপে একটা বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি। অনেক দূর, মানে ঢাকা থেকে এসেছি।' বনভন্তে বললেন, 'কি কারণে এসেছ, তা বলতে পার'। সুস্মিতা কিছুটা লজ্জিত হয়ে বলল, 'ভন্তে, সে বিষয়ে আমি আপনাকে কানে কানে চুপি চুপি বলতে চাই'। বনভন্তে স্বাভাবিক স্বরে বললেন, "আমাদের বৌদ্ধধর্মের বিনয় অনুযায়ী, কোন নারীর সাথেই ভিক্ষুরা কানে কানে চুপে চুপে কথা বলতে পারে না। কোন ভয় বা সংকোচ করো না। তুমি তোমার কথা বলতে পার।" সুস্মিতা বলল, "আমি যে বিষয়ে বলতে চাচ্ছি তা অত্যন্ত লজ্জার'। বনভন্তে বললেন, "তাহলে তুমি তোমার সাথে আসা সঙ্গীকে খুলে বল। সে আমাকে সব বুঝিয়ে বলবে।" শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অনুমতি পেয়ে এবার শিখা সহজ হয়ে বলল, "ভন্তে, সে আমার বান্ধবী। আমরা এক সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। আমি তাকে ঢাকায় আপনার কথা বলেছিলাম। এরপর আপনার প্রতি একান্ত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবশতঃ সে এখানে এসেছে।" অত:পর শিখা শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে সুস্মিতার পূর্বে উল্লেখিত সব কাহিনী বলল। আরো বলল, "ভন্তে, আপনি যে তাবিজ দেন না, সে কথা আমি তাকে বলেছি। কিন্তু তারপরও সে এমন একটা তাবিজ চাচ্ছে যার গুণে সে ঐ ছেলেটির স্মৃতি মন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলতে পারবে অথবা ছেলেটির সাথে পুনরায় ভালবাসা হয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। ভন্তে, অনেক দিন যাবৎ সে এ নিয়ে ভীষণ মনোকষ্টে আছে। তার প্রতি অনুকম্পাপূর্বক একটু আশীর্বাদ করুন।" সব কিছু শুনে সহানুভূতির সাথে সুস্মিতাকে পরম পূজ্য বনভন্তে বললেন, "শোন, সে ছেলেটি হল প্রচন্ড বিশ্বাসঘাতক ও হীন প্রকৃতির। তোমার ভাগ্য ভাল বলতে হবে। কারণ তোমাকে সে পূর্বেই ত্যাগ করেছে। যদি তোমাকে বিয়ে করে তারপরে সম্পর্ক ছিন্ন করত তখন কি অবস্থা হত, বলতে পার? কাজেই সেই বিশ্বাসঘাতক ছেলেটির সাথে আবার নতুনরূপে সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত হবে না। বিশ্বাসঘাতকরা হল সর্পের ন্যায়, যেকোন সময় ছোবল দিতে পারে। সে যখন তোমাকে ভুলে গেছে, তুমিও তাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাও।" কল্যাণমিত্র বনভন্তে তাকে উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে বললেন, "মনে কর, ক্যাসেটের কোন গান পছন্দ না হলে যেমন সেই গান মুছে রেকর্ডারে অন্য কোন গান রেকর্ড কর, ঠিক তেমনিভাবে তোমার মন থেকেও সেই ছেলেটির কথা একেবারে মুছে ফেল। মনের মাঝে কালিমা রাখা দুঃখজনক। তাই আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি– মনে শান্ত ও পবিত্র ভাব আনয়ন করে আবারও একাগ্রতার সাথে পড়ালেখা আরম্ভ কর। যা গত হয়েছে তা নিয়ে দুঃখ পাওয়া, অনুশোচনা করা বৃথা। মনে রাখবে, দুশ্চিন্তা মানুষের আয়ুনাশক, চিতার অগ্নির চেয়ে চিন্তার অগ্নি মানুষকে বেশী দগ্ধ করে। কাজেই মনের মাঝে কালিমা না রেখে ধীর–স্থির হয়ে তুমি পুনরায় উত্তমরূপে

পড়ালেখা আরম্ভ কর। সহসাই তোমার সকল মনোকষ্ট দূর হবে। নিশ্চয়ই তোমার সুখ, মঙ্গল ও উন্নতি সাধিত হবে। এটাই হল তোমার সর্বাপেক্ষা উত্তম তাবিজ।"

অবশেষে পরম পূজ্য বনভন্তের নিকট দেশনালয়ে উপস্থিত সকল দায়ক–দায়িকাদের সাথে সুস্মিতা ও পঞ্চশীল গ্রহণ করে এবং প্রসন্ন চিত্তে শ্রদ্ধেয় ভন্তের ধর্মদেশনা শ্রবণ শেষে সহাস্য বদনে বান্ধবী শিখার সাথে চলে যায়। যেতে যেতে সুস্মিতা ভাবে, বনভন্ত সত্যিই এক আশ্চর্য মহান পুরুষ। অর্হৎ বনভন্তের উপদেশে জীবনের হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নগুলো আবারও ফিরে পাওয়া সুস্মিতা ঢাকা শহরে তাঁর শত কর্মব্যস্ততার মাঝে এখনও বনভন্তকে মনে মনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। নিজের অজান্তেই যেন সে বলতে থাকে, 'বনভন্তে, মম হৃদয় মন্দিরে তুমি চির অধিষ্ঠিত'।

☞ যে কর্ম করে পরে অনুতাপ (অনুশোচনা) করতে হয়, অশ্রুমুখে কেঁদে কেঁদে যে কর্মের ফল ভোগ করতে হয়, সেরূপ কর্ম না করাই ভাল।

☞ যে কর্ম করে অনুতাপ করতে হয় না, যে কর্মের ফল সানন্দেও প্রসন্ন মনে ভোগ করা যায়, সেরূপ কর্ম করাই ভাল।

বালবর্গ, ধর্মপদ।

বৌদ্ধধর্ম ও বর্তমান চিত্র

শ্রীমৎ অভিজ্ঞানন্দ ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

বৌদ্ধ ধর্ম মুক্তির ধর্ম। গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত এ ধর্মমত ভারতবর্ষের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। সকল সংকীনর্তা ও কুসংস্কার বর্জিত বুদ্ধের ধর্ম সাধারণ জনমানসে এক সময় গভীর রেখাপাত করেছিল। হাজারাধিক বছর ধরে ভারতবর্ষে চলেছিল বুদ্ধচর্চা। যে পূণ্যতীর্থ ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি এবং ক্রমশ বিকশিত হয়ে ভারতবাসিকে ঐহিক ও পারত্রিক মুক্তির সন্ধান দিয়েছিল।যে ধর্মমত তৎকালীন প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় সংকীর্নতার লৌহ কপাট ভেঙ্গে সর্বসাধারণকে মুক্তি দিয়েছিল এবং এই ভারতবর্ষ থেকে উৎসারিত যে ধর্মমত একদা বিশ্বব্যাপি প্রসারিত হয়ে বিশ্বধর্মের মর্যদা লাভ করে এখনো সগৌরবে দীপ্তিমান সেই মানব কল্যাণ কর সর্বষাধারণের ধর্ম কিভাবে তার জন্মভূমি থেকে বিলুপ্ত হলো তা এক অতি বিস্ময়কর বিষয়। বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস বড়ই হৃদয় বিদারক ইতিহাস, যা আজ ও যেকোন সচেতন নির্বাণকামী বৌদ্ধের মনকে ব্যাথিত করে তোলে প্রতিনিয়ত। এ প্রসঙ্গে পন্ডিত হর প্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন "মুসলমান বিজয়ে বৌদ্ধ মন্দিরের ও বৌদ্ধ দর্শনের একেবারে সর্বনাশ হইয়া গেল। উহাতে ব্রাহ্মণদের প্রভাব বৃদ্ধি হইল বটে কিন্তু বৌদ্ধদের বদলে এখন মুসলমান মোলবী ও ফকির তাহাদের প্রবল বিরোধী হইয়া উঠিল। সুতরাং দেশের যেখানে যাহার জোর বেশি সেখানে আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এই রূপে বাংলার অর্ধেক বৌদ্ধ মুসলমান হইয়া গেল এবং অপর অর্ধেক ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইল, আর বৌদ্ধ দিকের মধ্যে যাহারা তখন নিজের পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল মুসলমান ও ব্রাহ্মণ উভয় পক্ষ হইতেই তখন তাহাদের উপর নির্যাতন উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে অনাচরনীয় করিয়া দিলেন অর্থাৎ অসভ্য, বাগদি, কৈর্বত, কিরাতের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। মুসলমানেরা তাহাদের উপর নানারূপ দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল।" (হর প্রসাদশাস্ত্রী, রচনা সংগ্রহ, ৩য় খন্ড, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা– ৪৯২– ৪৯৩) ভারতবর্ষের সর্বত্র মাটির নিচে, পর্বত গাত্রে, গুহায় বৌদ্ধ ধর্মের অতীত সাক্ষী বিদ্যমান। যে গুলো প্রতিনিয়ত আবিষ্কৃত হচ্ছে আর ঘোষণা দিচ্ছে বৌদ্ধ কৃষ্টি, সভ্যতা, ইতিহাস ঐতিহ্যের সমৃদ্ধময় স্বর্ণযুগের কথা। বলা বাহুল্য বৌদ্ধ ধর্মের মহামানবতার জয়গান, সার্বজনীন হিতোপদেশ যৌক্তিতক বিশ্লেষণে উপস্থাপিত দার্শনিক সিদ্ধান্ত এখনো মুক্তিকামী, চিন্তাশীল পন্ডিত মনীষীদের হৃদয় আকৃষ্ট করে। তাই এখনো বর্তমান বিশ্বে বুদ্ধ চর্চার বিরাম নেই।

গৌতম বুদ্ধের এ ধর্মমত এক সময় বাংলার আনাচে কানাচে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ধারায় ছিল সদা প্রবাহমান। বর্তমানে তা ধীরে ধীরে গতি হারিয়ে ফেলে বিভিন্ন অপশক্তির কষাঘাতে র্জজরিত হয়ে বুদ্ধের শাসন এ বাংলা থেকে প্রায় নিশ্চিন্ন হতে চলেছে যথার্থ ধর্মজ্ঞান শাসন রক্ষাকারক নিবেদিত প্রাণ ভিক্ষু ও দায়ক শ্রেণীর অভাবে। বর্তমান প্রজন্ম ও গড়ে উঠ্ছে ধর্মহীন অথচ উচ্চ শিক্ষিত হয়ে ফলে মেধাবী ও উচ্চ শিক্ষিত হয়ে ও বেশীর ভাগ হচ্ছে নিজ ধর্মচ্যুত। তা যে কোন সদ্ধর্মপ্রাণ নির্বাণকামী, বুদ্ধের শাসন রক্ষাকারী মানুষের হৃদয়কে আঘাত করবে বলে আমার বিশ্বাস। বর্তমান এ সমস্যার পিছনে তিনটি কারণকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি যা বর্তমান প্রজন্মকে বিপথে চালিত করে। (ক) শৈশবকাল থেকে পিতামাতাগণ তার সন্তানদের ধর্মজ্ঞান ও আচরণ শিক্ষা না দেয়া (খ) সপ্তাহের ছুটির দিনে বাধ্যতামূলক ভাবে সন্তানকে বৌদ্ধ বিহারে নিয়ে গিয়ে ধর্মীয় আচরণে উৎসাহিত না করা। (গ) স্কুল কলেজের বন্ধু বান্ধব (অন্যধর্মের) সাথে অনৈতিক সর্ম্পক স্থাপন ও তার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া। প্রতিটি পিতামাতা তার নিজ সন্তানকে বুদ্ধের ধর্ম শিক্ষা দিয়ে চার অপায় (নরক, তির্যক, প্রেত, অসুর) থেকে রক্ষাকরবে এটাই হওয়া উচিত প্রথম এবং প্রধান করণীয়। তাই সদ্ধর্ম রক্ষার্থে বর্তমান মেধাবী প্রজন্মকে মিথ্যাধর্ম, অপসংস্কৃতি ও নরকের করাল গ্রাস থেকে রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে প্রতিটি সচেতন পিতামাতাকে। তাহলেই ক্রমে নিশ্চিন্ন হওয়া এ জাতির ভাগ্যাকাশে দেখা দিবে নতুন আশার আলো, রক্ষাপাবে এই বৌদ্ধ জাতি, সদ্ধর্ম ও আপনার প্রাণপ্রিয় সন্তান। পরম পূজ্য শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ও সর্বদা এ সদ্ধর্ম ও জাতি রক্ষার্থে মূল্যবান দেশনা দিয়ে চলেছেন অবিরত। আজকের শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে সবাইকে মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানিয়ে, নির্বাণ কামনায়।

সাধু সাধু সাধু

পূর্ণিমা

আনন্দ জগৎ ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি

তোমার কথা মনে পড়ে.....;
প্রতিটি মেধায় মননে।
প্রবল দুঃখ রোদে
পাই আশা
হে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা
নির্বাণ চাই তোমারই স্মরণে।

এই দিনে.....
শাক্যসিংহ কুমার গৌতমকে তুমি
করেছো মহতো মহান।
জন্ম, সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ, মহাপরিনির্বাণ
এমন অপূর্ব ত্রি-স্মৃতি
বিজগের কোন সাহিত্যে নেই উল্লেখ।

তোমার সেদিনের সেই স্মৃতি
আজো দোলা দেয় প্রাণে
দিকে দিকে স্নেহময় প্রীতির বিশ্বাসে
শান্তি চেয়ে আজো তাই
শ্রমণ হয়ে
ঘুরছি সর্বত্র আজো
নিবিড় উচ্ছ্বাসে।

এখনো তোমার কথা
মনে পড়ে.....;
তোমার স্মরণে চলেছি ধূসর পথে
জাগতিক অন্ধকারে
স্নিগ্ধ বেনুবনে।

☞ মাতা পিতা কিংবা অপর জ্ঞাতিবর্গ (আত্মীয়-স্বজন) মানুষের যে উপকার করতে পারে না, সত্য নিবিষ্ট (পুণ্যকামীর) চিত্ত তাকে তদপেক্ষা বেশী উপকার করতে পারে।

চিত্তবর্গ, ধর্মপদ।